মহা জাগরণ

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৭
২রা মার্চ, ২০১১

মুদ্রণ
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
''অভিনব দর্শন''
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
infoavinabadarshan@gmail.com
Website : www.avinabadarshan.com (Free Site)

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
২) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

এই পরিদৃশ্যমান জগতে সৃষ্টির মাঝে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রতিনিয়ত বয়ে চলেছে এক মহা জাগরণের ঢেউ। আর এই জাগরণের ঢেউয়ের মধ্যে রয়েছে এক অপরূপ সুরের সাড়া। এই সুরের মাঝেই জীবের সহজাত সুর বিদ্যমান। তার থেকে এই জীবজগতের সৃষ্টি। প্রকৃতির এই অনন্ত জাগরণের ধারাবাহিকতার ধারায় রূপে রূপে রূপান্তরিত হতে হতে অসীম অনন্ত মহা জাগরণের সুরে সুরে ছুটে চলেছে সবাই নিজেরই অজান্তে এক মহা আনন্দের মিলন তীর্থে মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে।

প্রতিটি জীবের মধ্যে সর্বশক্তি বিদ্যমান। স্রষ্টার অনন্ত শক্তিতে জীবজগতের প্রত্যেকেই শক্তিমান। প্রকৃতির বিচারে, প্রকৃতির দানে কারও অধিকার কম, কারও অধিকার বেশী, তা হতে পারে না। এক একটি জীব এক একটি বিশেষ গুণ বা ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং জীবজগতে কেহ কাহারও চেয়ে শ্রেষ্ঠও নয়, নিকৃষ্টও নয়; বড়ও নয়, ছোটও নয়। আবার প্রতিটি জীবের ব্যথা বেদনা, মায়া মমতা, স্নেহ ভালবাসা, মাত্রায় কম বেশী হতে পারে; কিন্তু গুণগত বৈশিষ্ট্যের দিক হতে তা এক। কারণ প্রত্যেক জীবের মধ্যে স্রষ্টার প্রতিটি শক্তি অন্তর্নিহিত। এতৎ সত্ত্বেও জীবজগতের প্রতিটি জীবই স্বতন্ত্ররূপে গঠিত। কারও সাথে কারও চেহারার হুবহু মিল নেই, গলার স্বরের মিল নেই। এমনকি চরিত্রগত দিক দিয়েও মিল নেই।

আজ আমাদের চারিদিকে শুধুই হাহাকার। প্রতিপদক্ষেপে শুধুই হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমরা এখানে (এই পৃথিবীতে) কেউ কোনদিনই ছিলাম না। আর এসেছি বলে এখানে চিরদিন থাকবোও না। আমরা জানি, এক ফোঁটা জলও কেউ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবো না। তবুও আমরা ছল-চাতুরী, খুন-জখম, রাহাজানি করে, অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে, নিজেদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বৃদ্ধি করে চলেছি। ফলস্বরূপ সমাজের বুকে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছি।

আমাদের মধ্যে রয়েছে ক্লেদ পঙ্কিলতা, সংকীর্ণতা, দ্বন্দ্ব সন্দেহ, মিথ্যাচার। নানারকম অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন, লঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হয়ে, সমাজের নানা বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে, মানুষ আজ দিশেহারা হয়ে, যেন উত্তপ্ত চাটু থেকে জ্বলন্ত চুল্লিতে এসে পড়েছে।

জীবনের চলার পথে যত বাধা আসছে, তত আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। ঝড়-ঝাপ্‌টা না থাকলে সুখ-দুঃখে আমরা পঙ্গু হয়ে যেতাম। তাই এই ঝড়-ঝাপ্‌টার মধ্যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি (প্রতিটি ইন্দ্রিয়) যার যার তৃপ্তির জন্য সাধনা করে চলেছে। সেই তৃপ্তির খণ্ড খণ্ড রূপ হতে আমরা অখণ্ডের দিকে যাচ্ছি। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, ন্যায়-অন্যায় বোধকে জাগ্রত করার জন্য, আমাদের বিবেকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, বিবেককে জাগ্রত করে, মহা জাগরণের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

আজ আমাদের চারিদিকে কুয়াশা। গার্হস্থ্য জীবনে, সমাজ জীবনে, এমনকি মনো জগতেও আমরা কুয়াশার ঘেরাটোপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। এই কুয়াশা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় আলোর (সূর্যের আলোর) সাধনা। তাই আমাদের এখন জ্যোতির ধ্যান, সূর্যের ধ্যান করতে হবে। কারণ জ্যোতি হতেই জীবজগতের সৃষ্টি। এই জ্যোতির সাধনায় বর্হিজগৎ ও অর্ন্তজগতের কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত হতে হবে।

জীবের মুক্তি তখনই সম্ভব, যখন কোন জন্মসিদ্ধ মহানের সান্নিধ্য পাওয়া যায়। যে জ্যোতি, যে আলো, যে চিন্তাধারা হতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুর নিয়ে যিনি জন্ম থেকে আসেন, বিশ্বের সেই আদি শক্তি, সেই আদিতম বীজশক্তির পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে যিনি আসেন, তিনিই প্রকৃত মহান। এই বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত গতির সাথে সবার গতি এক করে যিনি মিশিয়ে দিতে পারেন, জীবের পরবর্ত্তী ব্যবস্থার গুরুভার যিনি বহন করতে পারেন, যিনি গতিদাতা হয়ে, জন্মের সাথে সাথে গতির পথ দেখাতে শুরু করেন, তিনিই প্রকৃত গুরু। তিনিই পারেন কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মহা জাগরণের মধ্য দিয়ে জীবকে মুক্তির পথ দেখাতে।

মহা জাগরণের মুক্তির স্বাদ জীবজগৎ যাতে উপলব্ধি করতে পারে, তারই জন্য জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনও ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমেতা তাঁর সেই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে, **অভিনব দর্শন** প্রকাশনের **৩৫-মত** শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হলো **'মহা জাগরণ'**।

শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৭ — *চপল মিত্র*

২রা মার্চ, ২০১১ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

আমাদের সুর মহা জাগরণের সুর সেই সুরে জাগ্রত হয়ে বিরাটের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

৪৬নং ভুপেন বোস এ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার, কোলকাতা
৩১শে আগষ্ট, ১৯৫০

এই পরিদৃশ্যমান জগতে নানা জীবজন্তু, গাছপালা পশুপাখী সকলেই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছে। প্রত্যেকটি জীব একই মাটিতে, একই আকাশতলে, এক সূর্যের আলোয়, একই জল হাওয়ায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং প্রকৃতির এই দানে অধিকার একজনের কম, আরেকজনের বেশী হবে কেন? মাটি, জল, আলো, বাতাসে সকলেরই সমান অধিকার। প্রত্যেকটি জীবেই সর্বশক্তি বিদ্যমান। ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, একেকটি জীব একেকটি বিশেষ গুণ বা ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং এখানে কাউকে কারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বলা যায় না।

মশা, মাছি, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির ব্যথা-বেদনা, স্নেহ-ভালবাসা, রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষমতা— মাত্রায় কম-বেশী হতে পারে, কিন্তু গুণগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তা এক। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই প্রতিটি শক্তি অন্তর্নিহিত। প্রত্যেকেই প্রতিটি বৃত্তি, প্রতিটি শক্তির অধিকারী। প্রয়োজন অনুসারে কারুর কোনটা বেশী, কারুর কোনটা কম। তুমি বুদ্ধি দিয়ে যেটা পার, ওরা বৃত্তি দিয়েই সেটা পারছে। যেমন ধর, মানুষ আজ বুদ্ধির চরম প্রয়োগ করে চাঁদের দেশে উড়ে গিয়ে গৌরব অনুভব

করছে। অথচ মশা, মাছি, কীট, পতঙ্গ পাখী— এরা তাদের সহজাত বৃত্তির ক্ষমতাতেই জন্মের সাথে সাথে আকাশে উড়তে পারছে। আমাদের এত বড়, এত শক্তিশালী যে পুলিশবাহিনী, তারা পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে একজন সাধারণ অপরাধীকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু একটা কুকুর কত মাইল দূরে গিয়ে একজন অপরাধীকে বের করে ফেলছে। ঘরের মধ্যে যদি কোথাও এককণা চিনি লুকিয়ে রাখ, একটা পিপীলিকা, আরশোলা বা টিকটিকির বেশীক্ষণ সময় লাগবে না, তা খুঁজে বার করতে। একটা আম কাট, পাশের ঘর থেকে কেউ টের পাবে না। অথচ শত শত মাইল দূর থেকে তার গন্ধ পেয়ে ছুটে আসবে মাছি। এত শক্তিশালী তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়। একটা সদ্যোজাত হাঁসকে জলে ছেড়ে দাও। দুই একবার হাবুডুবু খেয়ে সে সুন্দর সাঁতার কাটতে আরম্ভ করবে। একটা সাপকে আঘাত দিয়ে যতদূরেই পালিয়ে যাও, সেই সাপ ঠিক ঠিক আঘাতকারীকে খুঁজে বার করে, তার আঘাতের প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে। সুতরাং কাকে শ্রেষ্ঠ বলবে? **এই জীবজগতে কেউ কারুর চেয়ে শ্রেষ্ঠও নয়, নিকৃষ্টও নয়। বড়ও নয়, ছোটও নয়। স্রষ্টার অনন্ত শক্তিতে জীবজগতের প্রত্যেকেই শক্তিমান।**

সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারায় সৃষ্টবস্তুসমূহের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য দেখতে পাই। জীবজগতে প্রতিটি জীবই স্বতন্ত্র রূপে গঠিত। কারও সাথে কারও চেহারার হুবহু মিল নেই, গলার স্বরের মিল নেই। অথচ প্রতিটি বস্তুই রূপে রূপে রূপান্তরিত হতে হতে চলেছে। এই সমস্ত বৈষম্য ভাব বিরাটেরই এক এক অবস্থা। স্রষ্টাকে না জানলেও, খুঁজে না পেলেও সৃষ্টবস্তুসমূহের

নানা পরিচয়ের ভিতর দিয়েই যেন তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়। এই যে বিভিন্ন পদার্থ— দশ রকম পদার্থ নিয়েই হয় এক রূপ। বিভিন্ন নাম, সে যে একেরই নাম। তাই বিভিন্ন রূপ, সে তো একেরই রূপ। সেই রূপ ছাড়া আমরা কেউই নই। **এই জীবজগতের প্রত্যেকেরই দুঃখ-ব্যথা, জ্বালা যন্ত্রণা আছে। বরফ— তারও এক যন্ত্রণা আছে। বাতাস— তারও যন্ত্রণা আছে। আগুন— তারও যন্ত্রণা আছে। এই যন্ত্রণাগুলো, জ্বালাগুলো সমভাবে একটা নিয়ম মাফিক আসছে বলে এরূপ দেখা যাচ্ছে।** সৃষ্টি বিরাট— সৃষ্টবস্তুসমূহের নানা পরিচয়ের মাধ্যমে, মহা জাগরণের মাধ্যমে স্রষ্টা যেন নিজের সাথে নিজে কথা বলছেন। বস্তুতে বস্তুতে বিভিন্ন শক্তির যে স্ফূরণ, তা একই শক্তির বিকাশ। সমভাবেই নানা পরিচয়, প্রকারান্তরে একেরই ভাব। নানা পার্থক্যবোধ ব্যক্তিগত পার্থক্যই কেবল বুঝিয়ে দেয়। যেমন একই শরীরের পার্থক্যবোধ— শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি। বদ্ধ ঘরের টবের গাছ। সেও ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে মুক্তির জন্য এগিয়ে যায়। আজ আমরা বদ্ধ ঘরের অবস্থা তৈরী করে নিয়েছি। তবুও একটা কিছু চাইছি। সব কিছু জ্বালা যন্ত্রণা হতে উপশমের জন্য আমরা এগিয়ে চলেছি।

কি কারণে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি এক এক অবস্থার চাপে? আমরা চাইছি উপশম। আমরা মুক্তি চাইছি; শান্তি চাইছি। প্রকারান্তরে আমরা সাধনা করে যাচ্ছি। কিসের সাধনা? আমাদের সাধনা হচ্ছে উপশমের সাধনা। কাজেই প্রতিটি জীব যে অবস্থায় থাকুক না কেন, প্রত্যেকেই একটা উন্মাদনায় এগিয়ে চলেছে শান্তির দিকে। বিরাটকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করাই হল বিরাট শক্তি। সেই চাওয়ার পিছনে আমাদের

মন ছুটছে। **মহাকাশে মহাশূন্যে একটা সুর আপনমনে বয়ে চলেছে। সেই সুর হচ্ছে আদি সুর। ব্যথা-বেদনা, দুঃখ বিষাদ হতে উপশমের জন্য ইহাই বিরাট শান্তির সুর। সেই সুরকেই আমাদের সুরে আনতে হবে। তাহলেই চিরন্তন শান্তি মিলবে।**

এখন চলছে Crisis অবস্থা— ব্যাঘ্রের ঘাস খাওয়ার ন্যায় অবস্থা আমাদের। মন্ত্রের স্বাদ বা রসের স্বাদ যদি উপলব্ধি করা যায়, তবে ব্রহ্মত্ব লাভ করতে আমাদের দেরী হবে না। মন্ত্র (বীজমন্ত্র) আমাদের বিরাট; তাকে জাগ্রত করে নিতে হবে। আমাদের সুর মহা জাগরণের সুর। সেই মহা জাগরণের সুরে জাগ্রত হয়ে বিরাটের পথে এগিয়ে যেতে হবে। সাগর আর নদী, একই সূত্রে গাঁথা। সাগরের সাথে মিলনের পথে নদী বিভিন্ন নাম নেয় কেবল। এই ধরার বুকে প্রতিটি লোকই অবতীর্ণ। মহানের মহত্ত্ব নিয়েই প্রত্যেকের জন্ম। অসুবিধা এখন যে চলছে, তারজন্য দরকার একটু ছুটিয়ে নেওয়া গাঁইট (গিঁঠ) টুকুনু। গ্ল্যান্ডের গিঁঠগুলো ছুটিয়ে নিতে হবে। জপের (বীজমন্ত্রের) তাপেই তা সম্ভব। রূপের (উৎস) মূল খুঁজতে গেলে স্বরূপ বুঝতে দেরী হয় না। এই উদ্ভব এবং উদ্ভবত্ব— গ্ল্যান্ডের স্ফূরণ এবং ক্ষমতা অর্জন, প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। এখন ব্রহ্মনাম অসোয়াস্তি স্বরূপ। ভোটের জোরে রাজা মন্ত্রী হওয়া যেমন— Majority ভোট না পাওয়া পর্যন্ত অসোয়াস্তি (অস্বস্তি) রয়েছে। আমাদের সোয়াস্তির (স্বস্তির) সাধনা করতে হবে। আমাদের মননশক্তি ঠিকই আছে। বুঝি আর না বুঝি, শক্তির বিকাশও ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আগেই বলেছি, এক কণা মিষ্টি পড়ে থাকলেই পিঁপড়া মিষ্টির স্বাদ পায়। আর সর্প বহুদূরে গিয়ে দংশন করে আসে

প্রতিহিংসায়। এইসব জীবের যদি এত শক্তি থাকে, তবে আমাদের ভিতর দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণের ক্ষমতা জাগতে অসুবিধা কি?

'পারবো' এবং 'পারবো না', যে কোন অবস্থা আসতে একই একাগ্রতা শক্তির দরকার। কাজেই এই অবস্থা, একই শক্তির দুই ক্রিয়া, একই শক্তির দুই খেলা— একই জিহ্বাতে যেমন মিষ্ট স্বাদ এবং তিক্ত স্বাদ পাওয়া যায়। শুধু বুঝতে হবে। তখন বুঝ বুঝবে বুঝটুকুনুকে।

কুয়াশা আমাদের সম্মুখীন হয়েছে। দরকার সূর্যের তাপ। কাজেই আমরা জ্যোতির ধ্যান করে যাব, সূর্যের আলোর ধ্যান করে যাব। তবেই আলোর দেখা পাব। অন্ধকারেরও প্রয়োজন আছে। নতুবা আলোর অবস্থায় আসা যায় না। **আলোই আমাদের একমাত্র সাধনা— আলো অর্থাৎ জ্যোতি। তমসো মা জ্যোতির্গময়। জ্যোতিতেই আমরা সৃষ্ট, জ্যোতিদ্বারাই আমরা সৃষ্ট। জ্যোতির সাধনায় হবে মহা জাগরণ।**

একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে যেমন সমস্ত জগতকে জ্বালিয়ে দেওয়া যায়, আমাদের ভিতরের ৯৬°/৯৭° তাপ দিয়ে আমাদের অন্তর্জগতকেও তেমনই আলোকিত করতে হবে। সুপ্ত অবস্থা, ঘুমন্ত অবস্থার মাত্রাকে জাগরণের মাত্রায় আনতে হবে। প্রত্যেকের ভিতরে অজস্র অজস্র সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবী যে রয়েছে, তখনই বুঝা যাবে। এখন আশ্চর্য মনে হলে কি হবে, বিরাট রূপ, বিশ্বরূপই তখন আমাদের রূপ হয়ে যাবে। কি অদ্ভুত! সৃষ্টি রহস্য চিন্তা করলে শুধু আশ্চর্যের পর আশ্চর্যই হতে হয়।

ব্রহ্ম সৃষ্টবস্তুসমূহের মাধ্যমে নিজেকে নিজে জানার

জন্য একই প্রচেষ্টায় চলেছে। নিজেকে নিজে জানবার জন্য, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই বিরাট মারামারি, কাটাকাটি ও লড়ালড়ি হচ্ছে। সেইজন্যই এই বিরাট সৃষ্টি। প্রতি মুহূর্ত্তে বুঝবার জন্য সে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

বেড়াজালের সাধনাই আমরা এখন করছি। পাখী খাঁচায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে, খাঁচাতে থাকাটাই মুক্তির অবস্থা মনে করে। পাখীর ডানা ভারী হয়ে গেলে কেমন করে উড়বে? তবে ডানার ও শরীরের ব্যথা সেরে গেলে, খাঁচা খুলে দিলে পাখী আবার মুক্তির আনন্দে মুক্তাকাশে উড়তে পারবে। **ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছাতে হউক, সাধনাতে মগ্ন থাকলে সফলতা অনিবার্য। বুঝে বা না বুঝে জীবনের যাত্রাপথে তোমরা মুক্তিরই গান গাইছো। সেই গীতির সুরের সাথে প্রতি মুহূর্তের জাগরণের সুর মিলিয়ে নিতে হবে।** আঘাত, প্রতিঘাত আমাদের গতিপথের সহায়ক। সেই পরম সুরের সাধনায় একমাত্র সহায়কের কার্য করছে তারা।

প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয় সাধনা করছে যার যার তৃপ্তির। তারা যেমন সাধনা করছে, আমরাও সেরূপ করছি। সেই তৃপ্তির খণ্ড খণ্ড রূপ হতে আমরা অখণ্ডের দিকে যাচ্ছি। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় একত্রিত হয়েই, অন্তরে বিবেকের সুরে সুর মিলিয়ে সুস্বাদু ব্যঞ্জন (তরকারী) প্রস্তুত করে। দেখা দেয় জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, ন্যায় অন্যায় বোধ (বিবেক)। বিবেককে জাগ্রত করার সাধনা, সেই জ্ঞান অর্জনই আমাদের একমাত্র সাধনা। জীবনের চলার পথে যত বাধা আসছে, তত আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। ঝড়-ঝাপ্‌টা না থাকলে, সুখ-দুঃখে আমরা পঙ্গু হয়ে যেতাম। আমরা বিরাটকে, স্রষ্টাকে জানতে যাচ্ছি মূলমন্ত্র বা মূলবাণীর

সাহায্যে। আমরা জয়ের খেলা খেলছি। আমরা পরাজিত হতে পারি না। যে জিনিস জানলে সব কিছু জানা যায়, সেই অবস্থায় গেলে রোগ, শোক, দুঃখ-ব্যথা কিছুই থাকবে না। সব পালিয়ে যাবে। আমাদের সাধনা ব্যবসাভিত্তিক নয়। আমাদের সাধনা জাগরণের সাধনা, মহা জাগরণের সাধনা, নিজেকে জাগ্রত করার সাধনা।

নিজেকে যে সম্পূর্ণ বশে (control) আনতে পারবে, সেই প্রকৃত স্বাধীন। দেশবাসী যদি এমন হয়, দেশ তখন এমনিতেই স্বাধীন হয়ে যাবে। আমরা এগিয়ে যাব জাগ্রত যে বস্তু সম্মুখীন আছে, তার দিকে। আজ হীরক আমাদের সম্মুখীন। নোংরা কয়লার মধ্যেই হীরক (হীরা) থাকে। কাদা ছেনে ছেনে যেরূপ মূর্ত্তি হয় এবং সেই মূর্ত্তিকেই পূজা করে— ''শবারূঢ়ং মহাভীমং...'' ইত্যাদি। সেই মূর্ত্তিকার তখন নিজের পূজা নিজে করছে। আমরাও সেইরূপ নিজেকে গড়াচ্ছি। যে ভাবেই হোক, নিজেকে ছেনে ছেনে মূর্ত্তি তৈরী করছি। তখন আর আমাদের পাথরের মূর্ত্তির দিকে যেতে হবে না। আমার মূর্ত্তিকেই আমি দেখবো। রান্না আমরা শিখে গেছি। টোফামুছির (খেলনার) আর দরকার হবে না। মূর্ত্তিকে সম্মুখে রেখে আমরা নিজেদের গড়ে তুলছি, জাগিয়ে তুলছি। তাই মূর্ত্তি দর্পণ স্বরূপ। আমরা হারাইনি। এ অবস্থা কেবল সাময়িক। অনিবার্যভাবে আমরা জানবই। সাধনা সেখানেই সফল হবে।

প্রকৃতির ঐতিহ্যের সাথে, প্রকৃতির সুরের সাথে যে সুর মিলিয়েছে, সেই ''মহান'' নাম নিতে পারে। বিশ্ব প্রকৃতির পাঠশালায় শ্রেণীছাড়া কেউ নয়। **এখানে সবাই একই স্কুলের ছাত্র, প্রথম থেকে দশম— কেবল শ্রেণীর তফাৎ। ১ম, ২য়,**

৩য় শ্রেণীর ছাত্র যেমন একই হাই স্কুলের লম্বা বেঞ্চের সুরে গাঁথা আছে, প্রকৃতির শিক্ষাকেন্দ্রে আমরাও যে শ্রেণীতে আছি, সেই উপলব্ধিটা শুধু দরকার। প্রকৃতির ধারাপাতার ধারায়, প্রকৃতির বর্ণপরিচয়কে আমাদের বোধে আনতে হবে। আমরা কেহ ১ম, কেহ ৫ম, আবার কেহ বা উচ্চশ্রেণীর ছাত্র— শ্রেণীতে সবাই। মহানরা যাঁরা আসেন, তাঁরা আরও উপরের শ্রেণীতে তুলে নেন।

কে কিভাবে আসেন, সেটাই হ'ল প্রশ্ন। পৃথিবীতে মহানরা যাঁরা আসছেন, কে কোন্ ক্ষমতা নিয়ে আসেন, জানা প্রয়োজন। যদি একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে তবে প্রমাণ পাওয়া যায়, কে কি করেন না করেন। জন্মের ইতিহাস, পরিবেশ, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, এদের থেকেই প্রমাণিত হবে ইনি মহান কি না। আপনিই প্রমাণিত হবে, আলাদা করে প্রমাণ করতে হবে না।

এখানে এসে সাধনা করে যাঁরা মহান হন, তাঁদের টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা খুবই সামান্য। এই যেমন রিক্শাওয়ালা, ঠ্যালাওয়ালা ২/৪ জনকে নিয়ে যেতে পারে। আর জন্মগত মহান, বিরাট ক্ষমতার অধিকারী হয়েই জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা, তাঁরা অসংখ্যকে নিয়ে যেতে পারেন। যাঁরা সাধক তাঁরা একভাবে নেন। আর যাঁরা মহান, তাঁরা আরেকভাবে নেন। ভগবানের সত্তার সাথে নিজেদের যুক্ত করেছেন যাঁরা, তাঁরাও একভাবে নেন। এইভাবে সমস্ত বিশ্বের সবাইকে, একভাবে না একভাবে টেনে নেবার চেষ্টা চলেছে। এটাও প্রকৃতির বিধান বা নিয়ম। জগতে বহু মহান আসেন, তাঁরা যে ক্ষমতা নিয়ে আসেন, সেই ক্ষমতার প্রমাণ এই বাস্তবের

দ্বারাই পাওয়া যায় বা বুঝা যায়।

জন্মগত মহানদের বেলায় সেই ক্ষমতা কেমন? ইঞ্জিন যেমন বগি টেনে নিয়ে যায় সেইরকম। **একজন জন্মগত মহান লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে বগির মত টেনে নিয়ে যান। যেভাবে তাঁরা নিচ্ছেন, সাধনা করে যেতে হলে বহুবছর লেগে যেত। কিন্তু তাঁরা নিয়ে যান মুহূর্ত্তে। নিয়ম হচ্ছে যে, যে পৃথিবী থেকে মহান হন, সেই পৃথিবীতেই মহান হয়ে আবার আসেন, টেনে নিয়ে যাবার জন্য।**

জন্মসিদ্ধ মহান তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে সাধারণ হিসাবে সাধারণের সাথে মিশে যান এবং সবার কানে কানে এই বীজটা (দীক্ষামন্ত্র) দেন আর স্ক্রু এঁটে রেখে দেন। এইভাবে রাখতে রাখতে নেবার সময় একসাথে সব টেনে নিয়ে যান। যেমন ষ্টেশনে একটা একটা করে বগি সাজিয়ে রেখে দেয়। বগি ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে প্রায় ৫০০/১০০০ বগি মাইলখানেক লম্বা করে। তখনও ইঞ্জিনের দেখা নাই। তারপর ঠিক যাবার সময় ইঞ্জিন এলো হুস্ হুস্ করতে করতে। তারপর ঘটাং করে ধাক্কা দিল বগির সাথে। তখন তার সাথে বগিগুলোকে আটকিয়ে দেওয়া হলো। এখন ইঞ্জিন যেখানে যাবে, বগিগুলোও সেখানে যাবে, কোন চিন্তা নেই। **ইঞ্জিন আসার আগ পর্যন্ত বগির কি কাজ? গ্রীজ দিয়ে চাকাগুলোকে চালু রাখা, যাতে ইঞ্জিনের গতির সাথে গতি মিলিয়ে চলতে পারে। সেইটাই হ'ল এই নাম, জপ, স্মরণ-মনন। এটা হ'ল একটা পথ।** একেই বলে 'গুরু কৃপাহি কেবলম্'।

জন্মসিদ্ধ মহান বলেন, ''কবে ফুটে (গ্ল্যান্ডগুলো) উঠবে, তার জন্য যদি বসে থাকতে হয়, আর ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে

নিতে হয়, তাহলে কোন কাজ হয় না। দীক্ষামন্ত্র হচ্ছে পোষ্টকার্ডে স্ট্যাম্প দেওয়ার মতো। স্ট্যাম্প থাকাতে ইঞ্জিনের সাথে বগির যোগাযোগ হবে। পথে ঘাটে নাম দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের (দীক্ষিত সন্তানদের) এক কোটি এক মাত্রায় নিয়ে যাওয়া। তোমরা জপটা চাকা চালানোর মত ঘুরিয়ে যাও। **বোঝ বা না বোঝ, তার বালাই নাই। সিদ্ধি, মুক্তি আসুক বা না আসুক, সেদিকে খেয়াল করারও দরকার নাই। শেষে দেখবে, একই মাত্রায় ইঞ্জিনের সাথে এগিয়ে যাচ্ছ। সেখানে গিয়ে কাজ করবে। একবার বরফ হবে, একবার জল হবে, একবার বাষ্প হবে। তখনও নিজের সত্তার পূর্ণ জ্ঞান থাকবে। সেখান থেকে আবার এক কোটি এক মাত্রায় আর এক জায়গায় নিয়ে যাব।"** ABCD শেষ হয়ে গেলে যেমন আরও উঁচু গ্রন্থ পাঠের জন্য এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, তোমরাও এগিয়ে যাচ্ছ।

এমন জায়গায় যাবে, সেখানে আবার ঠাকুর (জন্মসিদ্ধ মহান) বলবেন, ''আবার তোমাদের এক কোটি এক মাত্রায় নিয়ে যাব।''

বুঝতে পেরেছ? **তোমাদের ঠাকুর ইচ্ছা করলে কিনা করতে পারেন? কোথায় কত মাত্রায় তোমাদের নিয়ে যেতে পারেন? আজ এই থাক।**

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

বেদের সুর মহা জাগরণের সুর

১৫৫, পার্কষ্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০১৭
২১শে জুন, ১৯৭০

মাঝে মাঝে বলি ঋষিদের কথা, বেদজ্ঞদের কথা। বেদের যুগে ঋষিরা বনে বনে সর্বত্র বেদের ধ্বনি নিয়ে, নাদ নিয়ে চর্চা করতেন। জীবজগৎকে উদ্ধার করার জন্য, জীবজগৎকে মুক্ত করার জন্য ঐ ধ্বনি, ঐ নাদ তাঁরা সবসময় করতেন। ঐ নাদ, ঐ ধ্বনিতে ছিল অনন্ত শূন্যের, মহাশূন্যের অনন্ত বার্তা।

এই যে শূন্য, এই শূন্য হতে কেমন করে জগৎ সৃষ্টি হল, তার যখন খোঁজ করা হয়, আজ পর্যন্ত তার সমাধান হয় নাই। শুধু এই পৃথিবী নয়, এমন পৃথিবী কত আছে, অগণিত পৃথিবী আছে। এই অনন্ত জগৎ কেমন করে যে সৃষ্টি হল, সেই কথা ভাবতে গেলে ভাবনার শেষ হয় না। তখন ঋষি নিজের সুরের সঙ্গে, নিজের সত্তার সঙ্গে অনন্ত আকাশের সুর মিশিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে বলছেন (বেদমন্ত্র...); মহাশূন্যের তত্ত্ব হতে, বিজ্ঞান হতে, তত্ত্বের তথ্য হতে ঋষি বলছেন (বেদমন্ত্র...); তিনি বললেন, ''রূপে রূপে রূপান্তরিত হতে হতে এই যে সৃষ্টি হয়ে চলেছে, এটাই রূপের বিকাশ, এটাই সৃষ্টির বিকাশ। সৃষ্টির প্রয়োজনেই এই সৃষ্টি। শূন্য হতে কি করে সৃষ্টি হয়? শূন্যের যে কথা, শূন্যের যে ধ্বনি, এই সেই বেদধ্বনি।''

এই শূন্যের পরম বিস্ময়, এই শূন্যের পরম বস্তুর পরম সন্ধান এই যে, শূন্যের যে শূন্য অবস্থা, এই অবস্থাকেই বলেছে ধ্বনির অবস্থা, তত্ত্বের অবস্থা। সমস্ত শূন্যটাকেই সুরের অবস্থা

বলে বলা হয়েছে। এই সুর দেখা যায় না। সুরের কোন রূপ নাই, এটা আদি বিজ্ঞানের কথা। কথাগুলি যে তোমরা বলাবলি করছো এবং শুনছো, এই কথাগুলিকে তো দেখা যায় না। সুরের যেমন রূপ নাই, এই কথাগুলিও সেইরকম। সুর শোনা যায়; সেটা নিশ্চয়ই কোন বিষয়বস্তুর সংস্পর্শে রয়েছে। **আবার কথাগুলি কোন বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে, শব্দধ্বনি কোন বিষয়বস্তুর সংস্পর্শে না আসলে, তোমরা শুনতে পেতে না। তাই শব্দকে বলা হয়েছে, শূন্যেরই অবস্থা, শব্দগুণকম্ আকাশম্। শব্দ যেমন শোনা যায়, দেখা যায় না।** শব্দ কানে আসে। শব্দ ধ্বনির যে অবস্থা— শব্দ এবং শূন্য, এই দুটি অবস্থা, একই অবস্থায় আছে। কথা, শব্দ, ধ্বনি, তত্ত্ব, যাবতীয় যা কিছু, শুনতে পাচ্ছ, দেখতে পাচ্ছ না। শব্দধ্বনি এবং শূন্য, এই যে দুটি স্তর— একটা স্তরে যদি কিছু জাগতে থাকে, আর একটারও সব কিছু জাগ্রত থাকবে।

শব্দ কিভাবে আসে? শূন্য যেইভাবে আসে। শব্দও দেখা যায় না; শূন্যকেও দেখা যায় না। শব্দ বিরাজিত শূন্যের সঙ্গে; শূন্য বিরাজিত শব্দের সঙ্গে। শূন্য ও শব্দ— একই কথা, একই বস্তু। সৃষ্টির আরম্ভের গোড়াতেই ধ্বনি এবং শূন্য। শূন্যতে ধ্বনি হয়। ধ্বনি এবং শূন্য একই অবস্থা। এই গর্জন, এই ধ্বনি— মহাশূন্য হতেই উদ্ভূত। মুখবন্ধ করে যেমন কথা বলা যায় না, শূন্য বিনা ধ্বনিও শোনা যায় না। শূন্য আকাশে মহানাদ ধ্বনিময় হয়ে আছে। শূন্য হতেই এই সমস্ত জগৎ আপনমনে সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই সমস্ত জগৎকে যদি নাদ বলি, ধ্বনি বলি, শূন্য বলি, তাতে ভুল হবে না।

আজ বাবা চলে গেছেন। বাবার বাবা চলে গেছেন।

তাদের খুঁজে পাচ্ছ না। এই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক— এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে যে দর্শন, স্পর্শন, স্বাদ, সোয়াদ ইত্যাদি পাচ্ছ— কে দেখছে, খুঁজে পাবে না। কে শুনছে, খুঁজে পাবে না। কে যে স্বাদ সোয়াদ গ্রহণ করছে, তাকেও খুঁজে পাবে না। খুঁজে না পাওয়ার অবস্থা ধ্বনিমাত্র। আবার ধ্বনিও খুঁজে পাবে না। তার থেকে যে আকার নিয়ে রয়েছে, তাকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা মনে করি, ধরেছি। কিন্তু যাকে তুমি ধরছো, তোমার ধারায় চিরকাল সে থাকছে না। **যাকেই তুমি আঁকড়িয়ে রয়েছ, সে চলে যাচ্ছে। কাউকে চিরকাল ধরে রাখা যায় না। মা বাবা স্বামী চলে যাচ্ছে। কত আপন বলে ধরে রাখি, কেউ থাকে না। সন্তান রেখে মা চলে যাচ্ছে। কত বাঁধনে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করি। কিন্তু সব ধ্বনিময় হয়ে সুরের সাথে মিশে যায়। মনে হয়, ফিরে আসবে। কিন্তু কোথায়? মিশে যায় যারা, তারা আর ফিরে আসে না।**

সবটাই ধ্বনিময় জগতে, সুরময় জগতে ধ্বনির আকার নিয়ে থাকে। শূন্য আকার নিয়ে সুর হয়ে আছে। **জল যখন জমাট বাঁধে, ধরে রাখা যায়। কিন্তু চিরকাল ওকে ধরে রাখা যায় না। হয়তো, তোমার হাতের তাপেই গলে গেল। তোমাকেই যখন খুঁজে পাওয়া যায় না, তুমি ধরে রাখবে কি? আবার মনে হয়, যেন ধরে রেখেছি।** কাকে ধরে রাখবে? এই বিশ্বসৃষ্টির রহস্যকে ধরে রাখার সন্ধানে সন্ধানে, এই প্রচেষ্টার প্রয়োজনের তাগিদে অনেক কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়।

বিশ্বসৃষ্টির রহস্য ধ্বনি— ধরে রাখার এতটুকু প্রয়োজনে, যতটুকু ধরে রাখা যায়। তোমরা হচ্ছ সেই অভিধান। অভিধানে সব কথা সাজানো আছে। জগতের যত

গল্প, সাহিত্য— যাবতীয় যা কিছু, খুঁজতে যাও, সব অভিধানে আছে। তুমি যেইভাবে সাজাতে চাও, সেইভাবে নয়। তবে সমস্ত বিশ্বের যাবতীয় কথাবার্তা, সব কথার জবাব, সব প্রশ্নের উত্তর— সব আছে সেই অভিধানে। বিধান যদি চাও, অভিধান খোঁজ। অভিধানে সব বিধান আছে। আমরা হচ্ছি অনন্ত জগতের অভিধান। এই জগৎ হচ্ছে, অনন্ত সৃষ্টির অভিধান। একটা শব্দ, একটা অর্থ খুঁজতে গেলে সমস্ত গ্রন্থ, সাহিত্য খুঁজে দেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অভিধান দেখ। সমস্ত খুঁজে পাবে অভিধানে।

অনন্ত বিশ্বের তত্ত্ব, সুর, রহস্য— সব কিছু, ফাঁকা জায়গায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আবার খুঁজে পাওয়া যায়। অভিধানে আছে; এর মধ্যে খুঁজে নাও। প্রত্যেকে প্রত্যেকের অভিধানে, যার যার দেহ ও মনের মধ্যেই সব খুঁজে পাবে। এর স্বাদ আছে, সোয়াদ আছে। অনন্ত জগতের অনন্ত সুর আছে; অনন্ত স্বাদ আছে। মধুময় সুগন্ধ আছে। মধু আছে, কত ফুল আছে, ফল আছে। এই অভিধানে, দেহ ও মনের এই অভিধানে সব সাজানো আছে, বাজানো অবস্থায় আছে। তুমি সাজিয়ে যাও, বাজিয়ে যাও। তুমি যদি সোয়াদ (স্বাদ) খুঁজতে যাও, ফাঁকা জায়গায় সোয়াদ খুঁজে পাবে না। দর্শন ইন্দ্রিয়, শ্রবণ ইন্দ্রিয় ফাঁকা জায়গায় খুঁজে পাবে না। তবে কিভাবে পাবে?

(বেদমন্ত্র...) যা কিছু বিশ্বের বিধান, তোমার অন্তরের মূলাধারের মূলে (বেদমন্ত্র...) খুঁজে পাবে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচক্র এবং সহস্রার— দেহবীণাযন্ত্রের এই অভিধানে (সপ্তচক্রে) সমস্ত রয়েছে।

মূলাধার হতে সহস্রারের গ্রন্থিতে সব সাজানো, বাঁধানো রয়েছে। এইখানে সুর রয়েছে। তাই মহাশূন্যের তত্ত্ব উদ্ধার করার জন্য ঋষি বেদের ধ্বনির চর্চা করে, বনে বনে শুনাতে আরম্ভ করলেন। ঋষি দ্বারে দ্বারে গিয়ে সবাইকে বললেন, **'হে মুক্ত জীব, তোমরা মুক্ত অবস্থায় আছ। তোমরা এই ধ্বনিকে আশ্রয় করে, সমস্ত জগতের ধ্বনিকে জানতে পারবে। সেই তত্ত্বকে আশ্রয় কর, যাতে সমস্ত তত্ত্ব খুঁজে পাবে। সেই সুরকে আশ্রয় কর, যাতে সমস্ত সুর খুঁজে পাবে।**

তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতামৃত দোহন করে বললেন, ''ঋষি, তুমি জগৎকে শ্রবণ করাও (বেদমন্ত্র...)।'' শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে দোহন করলেন। হনুমান হৃদাকাশে অনাহতে (বক্ষঃ স্থলে) রাম আর সীতাকে খুঁজে পেলেন। তাই তোমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে, সেই আকাশস্থিত রাম, আকাশস্থিত বিষ্ণু, নারায়ণ, আকাশস্থিত কৃষ্ণ, আকাশস্থিত শিবশম্ভু— এঁদেরকে স্মরণ করা। জগৎ সংসার এঁদের দেবতা আখ্যা দিয়েছিলেন কেন? সা রে গা মা— সুর চর্চা করে যেমন সুরজ্ঞ আখ্যা পায়, সেইরূপ **বেদ চর্চা করে যাঁরা বেদজ্ঞ হলেন, যাঁরা বেদকে হজম করেছিলেন, যাঁরা বেদকে আয়ত্ত করেছিলেন, তাঁরাই এই কয়জনই দেবতার স্থানে স্থান নিয়েছিলেন;—** এখানকার বেদানন্দ, গদানন্দ নয়।

সেই বেদে ভরপুর ছিলেন শিব। সেই শিবশম্ভু, যিনি পরমানন্দ স্বরূপ। সেই বিষ্ণু, সেই রামকে স্মরণ করলেন ঋষিরা। তাঁরা বললেন, এঁরা বেদের মধ্যে রয়েছেন। বেদ এঁদের আজ্ঞাচক্রে রয়েছে। বেদ এঁদের সহস্রারে রয়েছে। তাই তাঁদের স্মরণ করলে বেদকেই স্মরণ করা হয়। সাগরকে তো নিমন্ত্রণ করে ঘরে আনা যায় না। সাগরকে আনতে হলে খাল

কেটে কেটে আনতে হয়। সেইরূপ পরম বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করতে হলে, পথ বেছে নিয়ে তাঁকে আনতে হয়।

বেদের ধ্বনি কিরকম? বেদের ধ্বনি কিরকম জাগ্রত? মহাশূন্য সচেতনে ভরা। এই চেতন, এই চৈতন্য কেমন করে বুঝা যায়? এই জগৎ চেতন, না অচেতন? (বেদমন্ত্র...) বেদ বলেছে, ''দেখ, চেতন অচেতনের জন্য ভাবতে যেও না। তুমি, চেতন? না, অচেতন বলে পার্থক্য করো না। তুমি যখন তোমার সম্মুখে চেতনরূপে দেখছো, চেতন নামাকরণ করে বুঝবার সুবিধার জন্য ধরে নাও।''

তোমার জিহ্বায় চিনি দিলে মিষ্টি লাগে। তুমি যখন মুখে চিনি দাও, বলো 'মিষ্টি'। তোমার জিহ্বার মধ্যে কি নাক, চোখ রয়েছে? জিহ্বা কি করে বলে মিষ্ট? জিহ্বায় যখন মিষ্টি আছে, অভিধানে বলে দিল, জগৎময় মিষ্টত্ব রয়েছে। জিহ্বা বলে দিল, 'আমি স্বাদ নিয়ে বুঝলাম, আকাশের সর্বত্র মিষ্টময় হয়ে রয়েছে।' তবে আমরা হাঁ করে মিষ্টত্ব পাই না কেন? আকাশের থেকে হাঁ করে মিষ্টি পাওয়ার মত সেই জিহ্বা এখনও তোমার তৈরী হয় নাই। তৈরী হওয়ার মুখে, তুমি প্রথম তোমার জিহ্বায় আগে মিষ্টত্বের স্বাদ নিয়ে নাও। তোমার অভিধান কি বলে?

ঋষি— হাঁ করেই যদি মিষ্টত্ব পাই, তবে বিধান আছে, হাঁ করেই সবাই মিষ্টত্ব পাবে।

বেদ বলছেন,— তুমি অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তুমি কেন এই কথা বললে? মাথার উপরে খালি জায়গা হতে জল পড়ে নদী, পুকুর, খাল, বিল সব ভরপুর করে দেয়। আকাশ, এই খালি জায়গায় কখনও জল তো দেখ নাই। আকাশে কোনদিন

জল দেখেছ? হাঁ করলে তো মুখে জল পড়ে না। কিন্তু শুধু জলময় আকাশ। এক সাগর সম্মুখে, আর এক সাগর পদতলে (ভূগর্ভে), আর এক সাগর মাথার উপর। কয়েক সহস্র সাগরের জল আকাশে রয়েছে। তবে সেই আকাশের জলে হাবুডুবু খেয়ে মরছি না কেন? তোমার দেহ ও মনের অভিধান বলছে, তোমার স্পর্শে যখন এতটুকু পাচ্ছ, একথাই জানিয়ে দিচ্ছে, জলে ভরপুর হয়ে রয়েছে। অভিধান বলছে, আকাশভরা জল। এখন নিরাকার হয়ে আছে। তাই তুমি জলে ডুবছো না। কিন্তু **হাজার সাগরের জল রয়েছে মহাশূন্যে মহাকাশে। সেই অবস্থায় স্বাদ সোয়াদ, অন্তর্যামিত্ব, নির্বিকল্প, বিরাটের বিরাটত্ব— সবকিছু সাগরের ন্যায় ভরপুর হয়ে আছে।** আকার হয়ে থেকেও, আবার আকাশের জলের মতো, তোমার কাছে মনে হয়, আড়াল দিয়ে রয়েছে। কেমন করে? কেন আড়াল হয়ে রয়েছে?

(বেদমন্ত্র...) বেদ (প্রকৃতি) বলছেন, আমার সেই সমস্ত স্বাদ গ্রহণ করার জন্য তৈরী হও। এখানকার এই স্বাদ গ্রহণের জন্য তোমার জিহ্বা তৈরী হয়ে আছে। সা সা গা গা মা মা যারা করে, তারাই সুরজ্ঞ হয়। তারাই ওস্তাদ হয়ে সব গান গায়। সমস্ত সুর ধরা পড়ে তাদের কাছে। তেমনি অনন্ত সুর বাঁধা আছে মহাকাশে। সেই ধ্বনি চর্চা করতে করতেই সেই সুরে সুরজ্ঞ হবে; সেই ধ্বনি চর্চা করতে করতেই সেই সুরে চলে যাবে। তখন জিহ্বা যেদিকে রাখবে, অনন্ত স্বাদ সেভাবেই ধরা দেবে। অনন্ত জগতের যেই দিকে তাকাবে, সেই দিকেই তোমাকে জানিয়ে দেবে, স্বাদে সোয়াদে তোমাকে ভরপুর করে দেবে। তোমার ইচ্ছাধীনে তোমার দেহবীণাযন্ত্র চলবে।

সেই সুর সাধনার জন্যই দেবর্ষিকে বিষ্ণু আশীর্বাদ করেছিলেন। নারায়ণ বলেছিলেন, ''দেবর্ষি, তুমি জগতের কাছে, দ্বারে দ্বারে এই সুর পৌঁছে দাও। এইভাবে দ্বারে দ্বারে সুর দাও। এইভাবে বুঝে না বুঝে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বেদের ধ্বনির চর্চা করে যদি বেদজ্ঞ হয়, সাধনায় যদি তন্ময় হয়, তখন সহস্র স্বাদ সহস্রমুখী হয়ে আপনি বিকাশ হবে, প্রকাশ হবে; সিদ্ধি মুক্তি আপনি হবে। নির্বাণ নির্বিকল্পের দরজা খুলে যাবে। সব পথ সহজ হয়ে যাবে। দেবর্ষি, তুমি জানাও সেই নাম, সেই সুর।''

বিষ্ণুর কাছে এই আশীর্বাদ পেয়ে দেবর্ষি বললেন, ''প্রভু, এত কৃপা তোমার। জটিল এই তত্ত্ব এত সহজে তুমি পাওয়ার ব্যবস্থা করলে?''

বিষ্ণু— দেখ দেবর্ষি, শূন্যমার্গের জল (স্বাদ) তুমি গ্লাসে গ্লাসে পাবে। তুমি বস্তুর সাথে নিজেকে মিশিয়ে দাও। আপনি আবর্তের সাথে মিশে যাও।

তখন দেবর্ষি বিষ্ণুকে প্রণাম করে, শিবের কাছে গেলেন এবং হাত জোড় করে বললেন, ''প্রভু, কৃপা করো''।

শিব বললেন, ''দেখ, সমস্ত জগৎ, এই বিশ্ব সংসার প্রকৃতির ধারাবাহিকতার ধারায় সব বিধানের দিকে যাচ্ছে। জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রেহাই পাচ্ছে না। তুমি সবাইকে সজাগ করো। তাদের শুধু জাগাও। তাদের বল, ওঠ, ওঠ। জাগ, জাগ। ভোর হয়ে গেছে। **তোমরা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হও। তোমরা যে অজ্ঞানতার অন্ধকারে, নিরাশ হতাশের মধ্যে রয়েছ, এটা জন্ম জন্মান্তরের পাপ নয়, কোন পাপের ভোগ নয়। তোমরা ঘুমন্ত অবস্থায় আছ। তোমরা**

ঘুমিয়ে আছ। শিশুকে যেমন জাগায়, তেমনিভাবে তুমি জাগাও। বেদের সুর জাগরণেরই সুর, মহা জাগরণের সুর। সেই জাগরণের সুর বেঁধে, তুমি দ্বারে দ্বারে যাও।"

দেবর্ষি— এত সহজে যদি জীবের কল্যাণ করা যায়, এত সহজে যদি জীবের দ্বন্দ্ব, সমস্যার সুরাহা হয়ে যায়, তবে সকলের কাছে আমি এই মহা জাগরণের সুর পৌঁছে দেব।

তখন দেবর্ষি কি করলেন? তাঁর দেহবীণাযন্ত্রে মূলাধার থেকে সহস্রারে এই সুর বাজাতে আরম্ভ করলেন। আর বললেন, **"হে শিব, তুমি আশীর্বাদ কর। তোমার দেওয়া নাম যেন জীবকল্যাণে কাজে লাগে। মূলাধার থেকে সহস্রার যেন জেগে ওঠে।" মূলাধারে সুর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানই (মূত্রদ্বার) জগতের সৃষ্টির দ্বার। মূলাধারই মূল দ্বার। স্বাধিষ্ঠানই জীবের সৃষ্টির দ্বার। কেন তুমি এই মূলাধারকে মূল গ্রন্থি করলে, এখন আমি বুঝে নিলাম। তাতেই জেগে উঠবে মহাসৃষ্টি।** (বেদমন্ত্র...)

দেবর্ষি এই ষড়চক্র, এই সুরধ্বনি ও নাদধ্বনি স্মরণ করে, আকাশে মন নিবিষ্ট করে বাজাতে লাগলেন। (বেদমন্ত্র...) তিনি দ্বারে দ্বারে বেরিয়ে গেলেন। বেরিয়ে গিয়ে তিনি দেখলেন, একটাই ধ্বনি, রাম নারায়ণ রাম। তখন দেবর্ষি সর্বত্র সর্বময় দেখলেন, এই মহাকাশের মহানাম মহা স্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। তিনি নিজেকে আকাশময় করে, আকাশ হতে লেখনীর মাধ্যমে বাস্তবে আনলেন এই মহানাম, মহা জাগরণের নাম, রাম নারায়ণ রাম। তিনি শূন্য এবং ধ্বনিকে মিশ্রিত করে এই মহানাম উচ্চারণ করলেন, রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম।

শিব তখন এই নাম শুনে বললেন, "দেবর্ষি, এই নাম উচ্চারণে এক মুহূর্ত্তে বেদজ্ঞ হওয়া যায়।"

নারদ— প্রভু, এই মহানামের এত বড় অর্থ?

শিব বলে দিলেন, "হ্যাঁ। এত বড় বিরাট বিশ্বের অর্থ এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এই নাম একবার উচ্চারণ করলে সব রামময় (মহাকাশের সর্বশক্তির সমন্বয়) হয়ে যাবে। এক মুহূর্ত্তে বেদজ্ঞ হয়ে যাবে। এই কথা সবাইকে জানিয়ে দিও, দেবর্ষি।"

তাই দেবর্ষি কাঁদতে কাঁদতে দ্বারে দ্বারে সবাইকে বলছেন, মহা জাগরণের নাম শুনিয়েছেন রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সেই সেবাই হ'ল শ্রেষ্ঠ সেবা, যে সেবা জাগরণের সেবা, আর সেই সেবা করলে অমর হয়ে থাকা যায়

সুখচর ধাম (সন্ধ্যা ৭টা)
৯ই মে, ১৯৭৬

আজকে যে বেদের প্রচার চারিদিকে হচ্ছে, তোমরা যেভাবে প্রচারকার্যে নেমে গেছ, এটা হল সবচেয়ে বড় সেবা। **এক হাজার গো-দান করে আসলা, মনে করলা, "খুব বড় দাতা হয়ে গেলাম, এক হাজার গো-দান করছি।" গো-দান তো করে আসলা, এগুলিরে সব কোথায় নিয়া গেল, তাতো তুমি জানতাছ না। শেষবেলা যে কোথায় নিয়া গেল। গরুগুলি ভাবছে, "দেখ, ছিলাম ওদের বাড়ীতে। শেষবেলা আমাদের দান করে কসাইখানায় নিয়ে গেল।" গরুগুলি অভিশাপ দিল। দান কইরা (করে) তুমি অভিশাপ কুড়াইলা। সুতরাং ঐ গো-দানে, ঐ পুণ্যকর্মে কোন কাজ হবে না।**

রোগীর সেবা করলা। কর রোগীর সেবা। তাতেও কিছু না। রোগীর সেবা করা উচিত। না করলে উপায় নাই। তাতেও কোন উপকার নাই। শ্মশানে নিয়া মৃতদেহ পুড়াইয়া দিয়া আসলা। সেটাও বড় সেবা না। জলদান করলা, কম্বল দান করলা, প্রকৃতি বলছে, "এগুলো সব খুচরা সেবা। এগুলোতে কিছু হবে না।" তাহলে প্রকৃত সেবা কোন্‌টা?

প্রকৃতি বলছে, আমি সমস্ত জীবজগতে জলদান কইরা (করে) রাখছি। আলো দিচ্ছি, বাতাস দিচ্ছি। তাও বলছে যে,

আমরা খুচরা সেবা করছি। কারণ বাঁচিয়ে তো রাখতে পারছি না। প্রকৃতি থেকেই বলছে, প্রকৃতি নিজে বলছেন (তাঁকে দেবতা বলো বা স্রষ্টাই বল), "হ্যাঁ, আমি তোমাদের কম সেবা করছি না। এই যে বাতাস তোমাদের দান করে দিচ্ছি, এই যে আলো দিচ্ছি, এই যে জল দিচ্ছি, খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, কিন্তু আমার মনে একটা দুঃখ আছে।"

— কি দুঃখ?

আমি তোমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারছি না। সুতরাং এই সেবার কোন মূল্যই আমার নাই। সেবার মূল্য হইত যদি তোমাদের বাঁচাতে পারতাম, বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম। **যতই তোমরা জল খাও, আর বাতাস খাও। আলো খাও, গাছের ফলমূল খাও, মাটি থেকে উৎপন্ন শস্যকণা, উদ্ভিদ, লতাপাতা খাও। কিন্তু খেলে কি হবে? সবসময়ই তো তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি মৃত্যুর পথে। মৃত্যুর পথ থেকে তো তোমাদের উদ্ধার করতে পারছি না। সুতরাং যেই উদ্দেশ্যে আমি সৃষ্টি করলাম, nature (প্রকৃতি) বলছেন, যে উদ্দেশ্যে আমি সৃষ্টি করলাম, সেই উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত আমার তৃপ্তি নাই।**

তখন বেদজ্ঞরা, যাঁরা পণ্ডিত হয়ে গেছেন, বড় বড় সাধক হয়ে গেছেন, গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। এইরকম একজন দেবর্ষি। বেদের পূজারী তিনি, বেদজ্ঞ তিনি। নিজেই বেদ হয়ে গেছেন।

শিব বলছেন যে, সেবা তো করা হ'ল। সবই করা হইল, সবই। তিনি প্রকৃতির কাজে জিজ্ঞাসা করছেন, 'তাহলে সেবা, কোন্‌ সেবা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ?'

সেই সেবাই হ'ল শ্রেষ্ঠ সেবা, যে সেবা জাগরণের

সেবা। জাগরণের সেবা যে করতে পারবে, সেটাই হল সবচেয়ে বড়। সেই সেবা পেলে আর সেই সেবা করলে অমর হয়ে থাকা যায়। অমরত্ব লাভ করলে তাঁর ইচ্ছার উপরে সব ক্ষমতা এসে দাঁড়ায়। তাঁর ইচ্ছাধীনে সব হয়। কারণ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার এটাই হ'ল একমাত্র পথ।

মৃত্যুর হাত থেকে প্রকৃতি রক্ষা করতে পারছেন না। সূর্য, সেও মৃত্যুর অধীন। তাঁর মৃত্যুদিন ঘনিয়ে আসছে। পৃথিবী, সেও প্রতিদিন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এই জগতে এমন কিছু নেই, যে ক্ষয়ের পথে না যাচ্ছে, মৃত্যুর পথে না যাচ্ছে। কারও আয়ু ৬০/৭০ বছর। কারও বা আয়ু ১২ লক্ষ কোটি বছর। তাতে কিছু আসে যায় না। আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে ঘুরে আসতে আসতে ১২ লক্ষ কোটি বছর হয়ে যাবে। কিছু আসে যায় না। একদিন মরে যাবে। একদিন দেখবে, পৃথিবী নেই। পৃথিবী মরে গেছে। সূর্য মরে গেছে। সূর্যের তেজ নাই। পোড়া মাটি হয়ে গেছে। পোড়া মাটি যেমন ডেলা ডেলা হয়, এই পোড়া মাটির মতন সূর্য পড়ে রইছে। **এই সূর্য, যার এত তেজ, সেও অমর হইয়া আসে নাই। পৃথিবীও অমর হইয়া আসে নাই। এই বাতাস বুতাস, কেউ অমর হইয়া আসে নাই। সবাই আমাগো (আমাদের) মতন মৃত্যুপথ যাত্রী।** আয়ু বেশী নিয়া আইছে (আসছে) কেউ কেউ। শকুনের আয়ুতো অনেক বেশী। কচ্ছপের আয়ুতো অনেক বেশী থাকে। এই সূর্য-চন্দ্রের আয়ু অনেক বেশী। সাগরের আয়ুতো অনেক বেশী। তাহলে কি হবে?

সবাই বলছে, ''আমরা কেউ চিরকালের, চিরযুগের আয়ু নিয়া আসি নাই।'' সব ক্ষয়ের পথে। তারাও চিন্তা করতাছে (করছে), কার আয়ু সবচেয়ে বেশী? কোন্ আয়ুটা সবচেয়ে বড়?

আয়ু হচ্ছে, একমাত্র ফাঁকার আয়ু; এটাই সব চেয়ে বড়। শূন্যই ফাঁকা। এর জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। চিরকালের, চিরযুগের বলতে এই একটাই আছে। এই মহাশূন্য ফাঁকা। এর সীমানাও খুঁইজা (খুঁজে) পাইবা না। এর আদিও নাই, অন্তও নাই। এর উত্তরও নাই, এর দক্ষিণও নাই। পূবও নাই, এর পশ্চিমও নাই। ফাঁকা, যেদিকে যাইবা, সেদিকই দিক, সেদিকই ফাঁকা। ফাঁকা বলছেন, ''আমিই একমাত্র অমর।''

এই ফাঁকায়, এই মহাশূন্যের মধ্যে সূর্যগুলি, নক্ষত্রগুলি, গ্রহগুলি ঝুলতাছে জোনাকি পোকার মতন। এই ফাঁকা, এই মহাশূন্য এমন অনাদি, অনন্ত যে, সেখানে যদি চলতে চলতে সেকেন্ডে ১২ লক্ষ কোটি মাইল দৌড়াও, মনে রেখ, ১ কোটি ২ কোটি করে ১ লক্ষ কোটি, তারপরে ১২ লক্ষ কোটি। সেই ১২ লক্ষ কোটি মাইল যদি সেকেন্ডে দৌড়াতে শুরু করো যেদিকে ইচ্ছা, আর দৌড়াতে দৌড়াতে যদি ১২ লক্ষ কোটি বছরে গিয়ে দাঁড়াও, তখন যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'এখন তুমি কোথায় আসছো?' তাহলে দেখবে, যেখানে ছিলে সেখানেই আছো। **শেষ যার নাই, সেখানে সীমানাও নাই। যেখান থিকা (থেকে) আরম্ভ করছো, সেখানেই দাঁড়াইয়া আছো। শেষই যার নাই, এই একটাই একমাত্র অমর। এইটা যদি একমাত্র অমর হইয়া থাকে, তবে প্রকৃতি কেন বলবে না যে, ''তোমাদের আমি বাঁচাতে পারছি না, তোমাদের আমি সেবা করতে পারছি না। যেই কারণে আমি জীবকুলকে, অনন্ত কোটি গ্রহ-নক্ষত্রকে সেবা করে চলেছি, সেই কারণের মধ্যে তোমাদের পৌঁছিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নাই। আমার এই সেবার কোন মূল্য নাই।''**

সূর্যদেব এইজন্যই মাথায় হাত দিয়া বইসা (বসে) রইছে (রয়েছে)। বরুণদেব (জল) মাথায় হাত দিয়া বইসা রইছে। পবনদেব মাথায় হাত দিয়া বইসা রইছে। সাগরবেটা মাথায় হাত দিয়া বইসা রইছে। বসুমতী মাথায় হাত দিয়া বইসা রইছে। সবাই ভাবছে, ''করে তো যাচ্ছি। হজম তো হয় না। যা খাই, তাইতো বাইরাইয়া (বেরিয়ে) যায়; উপায় কি? উপায় তো দেখতে পাচ্ছি না।'' সবগুলি যন্ত্র, যা কিছু আছে, এই গ্রহ-নক্ষত্র সূর্য সবগুলি আবার ফাঁকার মধ্যে আশ্রয় নিছে। যে মরে না, যে অমর, তাকে 'বেঁচে আছে' বলা বৃথা। তাকে 'মরে না' বলা বৃথা। ফাঁকা যার শেষ নাই, তার মধ্যে আবার সবাই আশ্রয় নিয়া বইসা আছে। কারণ এই একমাত্র অমর। সেই অমরের (ফাঁকার) মধ্যে থেকে, অমরের সাথে আমরা যোগাযোগ করতে পারছি না। তার মধ্যে থেকে আমরা খালি মরতেই আছি; আর ডুবতেই আছি। সেইজন্যই সেবাইতরা যাঁরা সেবা করছেন, তাঁরা (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম) প্রকৃতির সেই মহান্ কর্মীরা ভাবছেন, ''আমাগো (আমাদের) সেবা তো বৃথা। আমরা যেইজন্য সেবা করছি, এই যে অমর মহাকাশ, তাঁর মতন না হওয়া পর্যন্ত গতি নাই।''

তাঁর (শূন্যের, ফাঁকার) মতন কি করে হওয়া যায়? এরজন্য পবন, সূর্য, সাগর, মাটি, বসুমতী প্রভৃতি সমস্ত কর্মীরা, সবাই লেগে গেল সেই সেবার জন্য যে, কি করে চির (যুগ) অমর থাকা যায়। কোনদিনই মরবে না, এই অবস্থায় কি করে জীবজগৎকে রেখে দেওয়া যায়? তবেই হবে আমাদের প্রকৃত সেবা। সেই সেবার জন্য দেখ, এই ঝড়-ঝাপ্টা বৃষ্টি-বাদল, আবহমান কাল থেকে হয়ে চলেছে। আজকের থেকে নয়, কোটি কোটি বছর হয়ে গেছে এই পৃথিবীরই বয়স। এই কোটি কোটি বছর যাবৎ এই ঝড়,

এই ঢেউ, এই বাতাস বয়ে চলেছে। এই পৃথিবী বিভিন্ন ঋতুতে তার উপহারের ডালি নিয়ে আসছে। আমের দিনে আম, কাঁঠালের দিনে কাঁঠাল খাওয়ায়, জাম খাওয়ায়, লিচু খাওয়ায়— খাওয়ায়ওতো কম না। এখন তোমরা যদি আকাম কর, কেউ হয়তো চুরি করে নিয়ে গেল, সেটা কার দোষ? এই বেটা তো ঠিকই, যথাসময়ে গাছে গাছে ফল ফলাইতেছে (ফলাচ্ছে)। একেবারে প্রাণান্ত কইরা (করে) ফেলাইল। কিন্তু কামের কাম তো (কাজের কাজ তো) কিছুই হইতাছে না। তাঁরা (প্রকৃতির কর্মীরা) বইয়া বইয়া (বসে বসে) আফশোস করতাছে, ''এরা (জীবকুল) শুধু খাইয়াই যায়, খাইয়াই (খেয়েই) যায় শুধু। কিন্তু বেইমানি করে। এরা তো কোন ভাল কাম (কাজ) করে না।''

তখন বেদজ্ঞরা চিন্তা করলেন। কি চিন্তা করলেন? পবনদেব, সূর্যদেব এত পরিশ্রম করছে, মাটি এত পরিশ্রম করছে, বেদজ্ঞরা চিন্তা করছেন, কিন্তু মানুষ তো পরিশ্রম করছে না। বেদজ্ঞরা তখন পবনের কাছে, সূর্যদেবের কাছে হাতজোড় করে বলেছেন, **''তোমরা সত্যিকারের কর্মী। তোমরা labour, শ্রমিক তোমরা। তোমরাই শ্রমজীবী। তোমরাই শ্রমদান করে জীবকুলকে বাঁচিয়ে রেখেছ। তোমরাই শ্রমিক। তোমরাই কর্মী।** প্রকৃতির দিক থেকে তোমরাই সত্যিকারের কর্মী। তোমরাই সত্যিকারের সেবা করছো। কোন মান, অপমান, সুনাম কোন কিছুতেই তোমরা যাও না। তোমরা আপনমনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে সেবা করে চলেছো। আমাদের এখন কর্ত্তব্য হচ্ছে, কি করে অমরত্বের শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, তার চেষ্টা করা।''

আমরা দেখতে পাচ্ছি, গ্রহ নক্ষত্রগুলো এই মহাকাশের থেকেই বার হচ্ছে। মহাকাশ থেকেই সবকিছু সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু

তিনি নির্বিকার। এই যে কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র মহাকাশ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে, বের হচ্ছে— একটাও বলতে পারবে না কোথা থেকে এসেছে? এই কোটি কোটি গ্রহের প্রত্যেককে যদি জিজ্ঞাসা করো, 'তুমি কোথা থেকে এসেছ?'

—আমি সূর্য থেকে আইছি (এসেছি)।

সূর্য, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

—আমি ঐ সূর্যের থেকে আইছি।

সেই সূর্য, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

—আমি? আমি আরেকটা সূর্য থেকে এসেছি।

আদি কই? আদি কোন্‌টা? কেই জানে না। কিন্তু জানে না বলে, একেবারে 'জানি না', একথা বললে চলবে না। দেখতেছি (দেখছি) যে, **আদিটাই শূন্য। যদি সব পৃথিবী গলিয়ে দেওয়া যায়, শূন্যেই মিশে যাবে। এক জায়গায় শূন্যের মধ্যেই সবার বাস। শূন্যে যাদের গতি, শূন্যে যারা আশ্রয় নিয়েছে, শূন্যেই যারা বাস করে, শূন্যকে কেন্দ্র করেই তারা বেঁচে আছে।** শূন্যের থেকেই, জল, বাতাস, আলো, জীবজন্তু— সব শূন্যের থেকেই বের হচ্ছে। অথচ শূন্যের মধ্যে দেখা যায়, কিছু নাই, ফাঁকা। 'কিছু নাই' থেকে এত কিছু বের হয় কি করে? বুঝা তো যায় না।

আমাদের বুঝিয়ে দেবার জন্য শূন্য কি করলেন? প্রকৃতি (শূন্য) যেন বলছেন, দেখ, আকাশের দিকে তাকাইয়া (তাকিয়ে) দেখ। আকাশে জল নাই। খুঁইজা (খুঁজে) জল পাবে না। উপরের দিকে দেখ, কেমন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে (চমকাচ্ছে)। কে বাতি জ্বালায় রে? ঐ বাতি কে জ্বালায়? কেমন রেখ দিয়া আলো কইরা (করে) দেয়? ঐ বাতি কে জ্বালায়? কে এই জল ফেলায়? শূন্যের

মধ্যে জল আছে। শূন্যের মধ্যে আলো আছে। তাহলে শূন্যের মধ্যে যে সব আছে, সেই বিষয়ে তোমাদের একটা আভাষ দিল মাত্র। বই লিখলে তার পূর্বাভাষ থাকে না? বইটা পড়ার আগে পূর্বাভাষ দিয়া দেয়। শূন্যের লগে (সঙ্গে) তো কথা কইতে পারবা না? তাই **সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারায় 'নাই'-এর মাঝেই যেন শূন্য বলছেন, "হ্যাঁ,** আমার লগে কথা কইতে পারবা না। কিন্তু তোমাদের আমি এমন একটি কথা বলিয়ে দিচ্ছি, তোমরা যদি বুঝে নিতে পার, তাহলে বাজীমাৎ করতে পার।"

কি বাজী? তোমাদের এই পৃথিবী থেকে উপরের দিকে সাড়ে তিন মাইল/চার মাইলের মধ্যে তোমাগো (তোমাদের) কিছু খেলা দেখাচ্ছি। কি খেলা? দেখ, কি খেলা। সাগরে ঢেউয়ের খেলা, মাটিতে ঝড়ের খেলা, নদী-পুকুরেও ঝড়ের খেলা, ঢেউয়ের খেলা। কি ঝড়-বৃষ্টি। সাতদিন বৃষ্টি হইলে (হ'লে) তলাইয়া (তলিয়ে) দিব একেবারে। একেবারে তলাইয়া ফেলাইব (তলিয়ে ফেলবো)। এই ক্ষমতা এই পৃথিবী থেকে উপরের দিকে সাড়ে তিন/চার মাইলের মধ্যেই আছে। এই বাতাসকে চোখে দেখ না। কত জল যে বয়ে নিয়ে যায়, দেখ? কত জল যে টাইনা (টেনে) নিয়া চলছে বাতাসে। কত সাগরের জল যে বাতাসের মধ্যে আছে, তার অন্ত নাই।

মহাশূন্য যেন বলছেন যে, ফাঁকার মধ্যেও আমি ভরা হয়ে আছি। যদি আমারে ধরতে পারো, তাইলে তোমরা জানতে পারবে। কিন্তু তোমরা আমারে ধরবেও না, জানবেও না। তোমরা পিছু মোরা দিয়া (পেছনে ঘুরে) যাও, বুদ্ধি টোকাও (খোঁজ) আর ছাতিমুরা (ছাতির আড়ালে) দিয়া বাড়ী যাও। আমারে ধরতে পারো না। এইজন্য বলছে যে, এত যে জল খালি (ফাঁকা)

মহাকাশে ভরা আছে, বর্ষণকালে সে বুঝিয়ে দেয়। এই ফাঁকা নিজেকে নিজে জানিয়ে দিচ্ছে তোমাদের যে, ''ফাঁকার মধ্যে আমি ফাঁকা হয়ে আছি। আমার নাক নাই, মুখ নাই, চোখ নাই, কান নাই, কিচ্ছু নাই। কোন কিছুই খুঁজলে আমায় পাবে না। কিন্তু 'নাই'-এর মধ্যে আমি যে 'আছি' এই সত্যটা কিছুটা আভাষে, পূর্বাভাষে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি। আমি ফাঁকা হইলে কি হইব? **আমার মধ্যে সব বোধ আছে, সব জ্ঞান আছে, সব সুর আছে। তোমরা শুধু যদি হাতড়াইয়া (হাতড়ে) নিতে পার এই ফাঁকার মধ্যে থাইকা (থেকে), তাইলে তোমরাও দেখবা। তাইলে তোমরাও অমর হইয়া, অমরত্ব লাভ করিয়া এই মহাকাশে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া, সমস্ত বিশ্বের সুরকে অবগত হইয়া, মহানন্দে চিদানন্দে বিরাজ করিয়া, তার তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, অনন্ত যোগের পথের যাত্রিক হইয়া, এগিয়ে যেতে পারবে।** সেই যাত্রিকের যাত্রাপথেরও শেষ তুমি পাবে না। কিন্তু আনন্দে আত্মহারা হইয়া, সেই আত্মহারার তন্ময়তার মধ্য দিয়া তুমি তোমাকে খুঁজে পাবে যে, কত আনন্দ, কত সুন্দর। কারণ সেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, জন্ম নাই, কিচ্ছু নাই। কিন্তু ফাঁকার মতন ফাঁকার মধ্যে আঁকা হইয়া, তুমি ফাঁকাতে বিচরণ করিয়া নিজস্ব সুরে ও সাড়ায় তন্ময় থাকতে পারবে। এইটুকুনু ইঙ্গিতের মাধ্যমে, প্রকৃতির ইঙ্গিতের মাধ্যমে তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে। এটাকে ধরে নিতে হবে।

বেদজ্ঞরা তখন কি করলেন? তাঁরা এইটুকুনু করলেন যে, তাঁরা চিন্তা করে দেখলেন, মহামুস্কিল। সাধারণ মানুষ তো বুঝতেও পারবে না, ধরতেও পারবে না মহাকাশের এই সুর। তখন তাঁরা এই সা-রে-গা-মা-র মতন একটা স্বরগ্রাম এই শূন্যের থেকে, এই

আকাশ, বাতাস, জল থেকে বার করলেন। এই স্বরগ্রামটাই তোমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আজ তোমরা মহানন্দে যে 'রাম নারায়ণ রাম' ধ্বনি উচ্চারণ করছো, এই 'রাম নারায়ণ রাম' মিথিলায় সীতার স্বামী বা অযোধ্যার রাম নয়। এখানকার নাম নিয়া বইসা থাইকো না (বসে থেকো না)। এই রাম আর নারায়ণ কিন্তু ঐখানকার (মহাকাশের) বর্ণনায় তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী— এইরকম নাম বা উপাধি দেয় না?

এই 'কৃষ্ণ' নামও ঠিক তাই। তুমি মনে কোর না, মথুরা বা বৃন্দাবনের কৃষ্ণের কথা বলা হচ্ছে। ঐখানকার (মহাকাশের) কৃষ্ণের নামটা, এখানকার মানুষটিকে ভাল লাগে বলে, তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর গুণে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ নামটা তাঁকে দেওয়া হয়েছে। রামের বেলায়ও ঠিক তাই। নারায়ণের বেলায়ও ঠিক তাই। শিবের বেলায়ও ঠিক তাই। **মহাকাশের বর্ণনার সাথে যাঁদের একটুখানি মিলের আভাষ পেয়েছে, তাঁদেরই মহাকাশের নামে নামকরণ করা হয়েছে।**

যাইহোক, চিন্তা করে দেখ, 'রাম' শব্দের অর্থ বৃহৎ, পরম বৃহৎ। বড়, অনেক বড় বুঝাতে আমরা 'রাম' শব্দের ব্যবহার করে থাকি। রাম বোকা অর্থ কত বড় বোকা (খুব বোকা)। রাম ছাগল সেইটাও বড়। এঃ রাম রাম রাম, এইটাও বড়। বিরাট ঘৃণার জিনিস। কি রে, কি রে? কোথায়, কোথায় কোথায়? বোঝে একটা কিছু, একটা নোংরা কিছু আছে, সেইটাও সাংঘাতিক। 'রাম' শব্দটার সাথে যুক্ত, সবটাই দেখা যাচ্ছে সাংঘাতিক। বাড়ীতে কাজ করে 'রামা' 'রামা'— সেও সাংঘাতিক। 'রামা' কাজে এত নিপুণ যে, 'রামা' ছাড়া একদণ্ডও চলে না। দেখা

যাচ্ছে, 'রাম' এইরকমই একটি শব্দ, যেদিক দিয়া গেছে, সেইটাই সাংঘাতিক হইয়া গেছে। নোংরাতেই যাক, ভালতেই যাক, মন্দতেই যাক, ডাকাতিতেই যাক, সাংঘাতিক। এই সাংঘাতিক ব্যাপারটা কোন ব্যক্তির মধ্যে যখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তাঁকে সম্মান জানানো হয়েছে। তাঁর আদর্শে তাঁর উদারতায় মহাকাশের সেই ব্যাপকতার সুর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। **বাতাসের মতো স্বচ্ছতায় ভরপুর তাঁর সেবা, তাঁর প্রজারঞ্জন, আলোর মতন তাঁর প্রকাশ, তাঁর চিন্তাধারা দেবতুল্য— তখন ঋষিরা বললেন, মহাকাশের যে রাম, যে বর্ণ সেই বর্ণের সাথে এইখানকার দশরথ পুত্রের বর্ণের অনেকটা আমরা মিলতি পাই বলে 'রাম' নাম দিয়ে তাঁকে সম্মান দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণের বেলায়ও ঠিক তাই। যুদ্ধে বিগ্রহে, উদারতায়, কার্যে কলাপে, কৌশলে আর সর্বদিকে সমানভাবে তাঁর সেবার সুরটা খুঁজে পেয়েছেন বলেই, সেই আকাশরূপী কৃষ্ণ বর্ণের সাথে মিলতি রেখে 'কৃষ্ণ' আখ্যা দিয়ে দেবতারূপে তাঁকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছেন।**

শিবও তাই। শিব হচ্ছেন মঙ্গল। এই মঙ্গলময়ের যে মঙ্গলচিন্তা, মঙ্গলধ্বনি আকাশ, বাতাস, আলোর থেকে আমরা পাচ্ছি, সেই মঙ্গলধ্বনি, মঙ্গলের কথা তাঁর থেকেও আমরা পাচ্ছি। তিনিও মঙ্গলের কথা সবসময় চিন্তা করেন। তাই মঙ্গলময় হিসাবে 'শিব' নামে তাঁকে আখ্যা দিলেন। শিব নামে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করলেন। তাই তাঁরা সমাজের বুকে পূজনীয় হয়ে আছেন এবং শিরোমণি হয়ে রয়েছেন। তাঁদের সাথে ঐ মহাকাশের বর্ণের কিছু কিছু মিল আছে। ঐ মহাকাশের তত্ত্বের সাথে যাঁদের আখ্যা দিতেন, ব্যাখ্যা দিতেন, বর্ণনা করতেন, তাঁরা সমাজের দেবতা, দেবতা। এইভাবে তাঁরা সমাজকে তৈরী করলেন। তখন বেদজ্ঞদের

সাথে সাথে শিবও চিন্তা করলেন, কি করে সমাজকে এই অমরত্বলাভের মহামন্ত্র মহাস্বরগ্রাম দিয়ে দেওয়া যায়, যা পেয়ে অমরত্বের সাধনায় সেই সুরে সুর দিয়ে, সবাই মহানন্দে বিরাজ করতে পারবে। তিনি (শিব) দেখলেন যে, সাধারণ মানুষ এগুলি খুঁজেও পাবে না, বুঝতেও পারবে না, এ অসম্ভব। তাই তাঁরা খুঁজে নিয়ে আসলেন এই 'রাম নারায়ণ রাম'।

আজ তোমরা যে 'রাম নারায়ণ রাম' অতি সহজে বলতে পারছো, একদিন তাঁরা গলদঘর্ম হইয়া (হয়ে) সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের বার্ত্তা এনেছেন, সূর্যের থেকে বার্ত্তা নিয়ে এসেছেন, চাঁদের থেকে বার্ত্তা নিয়ে এসেছেন। গ্রহ উপগ্রহের থেকে বার্ত্তা নিয়ে এসেছেন। পরিশেষে গাছপালা, জীবজন্তুর থেকে বার্ত্তা এনে তাঁরা এই শব্দ কয়টা ব্যবহার করলেন। তাই তোমরা আজ যে 'রাম নারায়ণ রাম' মহাধ্বনির সাধনা করছো, সেবা করছো, একাগ্রচিত্তে করে যাও। এই সাধনায় এই সেবায় চারিদিক থেকে এক অপূর্ব সাড়া আমরা পাচ্ছি।

তোমাদের পূর্ব পুরুষরা এখন অনেকেই নাই। তাদেরও পূর্বপুরুষরা একেবারেই নাই। তাদের থেকেই তোমরা। তোমরা তাদেরই স্মৃতি বহন করে চলেছো। সুতরাং তাদের মতো মৃত্যু যেন তোমাদের না হয়। হাটবাজার করে শেষবেলা খইল্‌তা (থলে) নিয়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। কেরোসিনের বোতল হাতে নিয়া চিৎ হইয়া পইরা রইলা (পরে রইলে)। এই রকম মৃত্যু যেন না হয়।

তোমরা প্রাণ ঢেলে সেবা করে যাও। কোন্ সেবা? এই স্বরগ্রাম, যে স্বরগ্রাম দিয়েছি, 'রাম নারায়ণ রাম' মহানামের এই স্বরগ্রাম চারিদিকে বাজিয়ে বাজিয়ে এই দেহযন্ত্রটাকে সেই সাড়ায়,

সেই সুরের সাড়ায় নিয়ে একেবারে তন্ময় হয়ে যাও। দেখবে, কি অফুরন্ত শক্তি তোমার মাঝেই ফুটে বের হবে। গাছের বীজ মাটিতে পুঁতে দিয়ে রোজই কি তাকাও, ঐ শিকড় বাইরাইলি না রে (বের হলি না রে)? আরে শিকড় বাইরা (বের হ)। অঙ্কুর গজা (বের হ)। এই টানাটানি তোমাগো (তোমাদের) করতে হবে না। বীজ পুঁতে দিলে। জল দাও। দেখবা, আস্তে আস্তে কইরা (করে) অঙ্কুর বাইরাইতাছে (বের হচ্ছে)। শিকড়, বাকলা বাইরাইতাছে (বের হচ্ছে)। দেখা গেল, লম্বা হইয়া এদিক ওদিক গিয়া ইয়া বড় বড় একেকটা ডালপালা বাইর হইছে (বের হয়েছে)। আরে সর্বনাশ, বীচিটা এতটুকু। আর এগুলি এত বড় বড়। এ্যাঁ, সৃষ্টির তত্ত্বে মাহাত্ম্য কি রে বাবা। এতবড় বিভূতি তো আর কিছু নাই। পুঁতলাম এতটুকু। আর বাইরাইল (বের হল) কি। তারমধ্যে আবার এতগুলি। এতবড় ম্যাজিক আর কি আছে বল। এতটুকু বীজ মাটিতে পুঁতে দিলে, তার থেকে হ'ল কত বড় গাছ। সেই গাছের মধ্যে অসংখ্য ফল। আবার প্রতিটি ফলের মাঝে বীজ। কি সুন্দর বলতো। সৃষ্টির ধারায় এই বিভূতি, এই শক্তির প্রকাশ তোমাদের মাঝেও হবে। 'রাম নারায়ণ রাম' মহানামের শক্তির স্ফূরণ যখন হবে, নিজেরাই অবাক হয়ে যাবে। আজ এই থাক। রাম নারায়ণ রাম।

সুতরাং এই সেবাই হলো শ্রেষ্ঠ সেবা, মহা জাগরণের সেবা, যে সেবা প্রকৃতির মাঝে বয়ে চলেছে নিরন্তর।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

"মন এই বাতাস, সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের চেয়েও অনেক বড়"

পাম এ্যাভিনিউ, কলকাতা
১৮ই আগষ্ট, ১৯৬৭

এই দেহবীণাযন্ত্র প্রকৃতির মহা দান। এর মাঝে রোগ শোক, দুঃখ, ব্যথা-যন্ত্রণা সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। তুমি ভরপুর হয়েই আছ। ভরপুরের মাঝে সুর দিয়ে সুর টেনে নাও। মূলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত সাতটি চক্রে দেহবীণাযন্ত্রকে ভাগ করা হয়েছে। মহাশূন্যে মহাকাশে আছে ধ্বনি। সপ্তচক্রের সপ্ততারে সেই ধ্বনির যন্ত্রকে বাজাও। আলোর ভাণ্ডার চলে আসবে। আজ্ঞাচক্রে মন নিবিষ্ট কর। স্মরণ কর বেদকে। বেদ সবার জন্য। বেদের সার কথা অনন্ত প্রকৃতির সুরে সুরে গাঁথা আছে।

রাধাকৃষ্ণের সুরের গভীরতা কোথায়? রাধার একমাত্র কৃষ্ণ সাধনাই ছিল। কৃষ্ণ সাধনায় তন্ময় হয়ে রাধাই ছিল। রাধা হচ্ছে ধারা; অনন্ত বিশ্বের ধারা, যার থেকে অনন্ত সৃষ্টি হয়েছে। আকাশ হচ্ছে কৃষ্ণ। ধারা ধারা বারবার বললে রাধা হয়ে যায়। মহাশূন্যের থেকে অফুরন্ত সেই ধারাই হ'ল রাধা। রাধা সংসারে আলাদা করে বিচার করবে না। বেদের সারমর্ম, অনন্ত মহাকাশের মহা ধ্বনিতে সাধা ও গাঁথা। মহাকাশরূপী কৃষ্ণ সমস্ত জীবের মধ্যে লীন হয়ে গেছেন। **জীবের যে সুর, জীবনের যে সুর, সেটাই বেদের সুর। তোমাদের সত্তায়**

রয়েছে বেদের সুর। বেদের ধর্মের কথা আলাদা কিছু নয়।

মন বসাবার কোন প্রয়োজন আছে? মনকে চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত হতে দাও। স্রষ্টাই দেবদর্শন, মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। জপ, ধ্যানে মন দৌড়াদৌড়ি করুক, কোন ক্ষতি নেই। সর্বাবস্থায় সে তার গভীরতার মধ্যেই থাকবে। মনের গণ্ডীর কোন শেষ নাই। বাতাস যদি বলতো, আমাকে আটকে রেখে দাও, কি হতো বলতো? বাতাস যদি বসে পড়তে চাইতো, তবে তো সৃষ্টি শেষ। সর্বত্র অবাধ গতি, এটাই তার প্রসারতা, ওটাই তার ধ্যান। **মন এই বাতাস, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের চেয়েও অনেক বড়। কি করে তাকে আটকে রাখবে?** এভাবেই চলবে। নদীর ঘোলা জলের মাটি থিতিয়ে পড়ে পড়ে জমি তৈরী হয়। মনের মধ্যে অগণিত পলিমাটির মত স্তর রয়েছে।

মনন শক্তির মহা জাগরণ ঘটিয়ে মনের পলিমাটির প্রতিটি স্তরকে উর্বর (জাগিয়ে) করে তুলতে পারলে, আলো বাতাসের মতো সর্বত্র অবাধ গতিতে বিচরণ করতে পারবে।

বিষ্ণু বলছেন, আমার মত বিষ্ণু অগণিত; এই মহাশূন্যের প্রতিটি কণার মধ্যে একটি বিষ্ণু রয়েছে। বসুমতীর প্রতিটি কণা এক একটি পৃথিবী। মহাশূন্যে অণু হয়ে, কণা হয়ে বিচরণ করছেন বিষ্ণু। শূন্যের শেষ নেই। মনেরও শেষ নেই। সমস্ত আকাশকে মন বলা হয়। **প্রতিটি অণুই সৃষ্টির এক একটি বীজ। প্রতিটি বীজে রয়েছে অগণিত ক্ষমতা। বিষ্ণু বলছেন, শত সহস্র লক্ষ মনের মাঝে মন হয়ে প্রস্ফুটিত হচ্ছি বীজ আকারে। শত সহস্র বিষ্ণু তোমাদের মনের মধ্যে আছে।** তাহলে কেন এই হিংসা দ্বেষ? মনে মনে আগুনেও হাত দেওয়া যায়, বরফেও হাত দেওয়া যায়। গভীর তন্ময়তার সুরে সুর

দাও। আপনিই পরিস্ফুটিত হবে। বীজ পরিণত হয় বৃক্ষে। সে বলছে, অসার খেয়ে সারে পরিণত করছি। নর্দমা থেকে ক্লেদ, পঙ্কিলতা, মাটির নীচ থেকে, আবর্জনা থেকে রস টেনে টেনে আমার শিকড় দিয়ে আঁকড়ে ধরে বের যখন করি, সেটা সার। যেটা পরিত্যাজ্য, সেটাও আমার। যখন ফুটে বের হই, কত সুন্দর সুন্দর ফুল। মনের শিকড় যত ক্লেদ, নীচতা, সংকীর্ণতা, আঘাত, প্রতিঘাত, হীনতম কাজ— চিন্তায় ভাবনায় সব কিছুর রস পান করে চলেছে। **মিষ্টত্বের মধ্যে কি নর্দমার গন্ধ পাও? মন কিভাবে যে টানে, তোমরা বুঝে নাও। অদ্ভুত তার ক্ষমতা। মনকে ছেড়ে দাও। যতই যা দাও, যা দরকার মন সেটাই টেনে নেবে।** নিম গাছের গোড়ায় চিনি, দুধ দাও। সে তিক্ততা (তিতা) টেনে নেবে। খেজুর মিষ্টি টানবে। তোমার মনের শিকড় দিয়ে নানা বস্তুর রস চুষতে থাক। বুদ্ধি, মুক্তির পূর্ণতা নিয়ে সব স্বাদে সোয়াদে বার হবে, তোমায় ভাবতে হবে না। নিশ্চিন্ত থাকো, বিচলিত হয়ো না। বিচলিত মন, তার খাদ্য, তার খোরাক খুঁজে বেড়ায়। যত ক্লেদ টানুক না কেন, এই বীজ ঠিক ফুটে বেরোবে। এই বীজ ঠিক সিদ্ধি, মুক্তি, নির্বাণ হয়ে বের হবে। একদিনের শিশুও বোঝে, কিভাবে মধু চাটতে হয়। মন যেদিকেই যাক, যেখানে খুশী যাক, তুমি মহানাম কর, সুরে সুরময় হয়ে থাক। আকাশমুখী হয়ে থাকলেই সমস্ত দেবতাকে খুঁজে পাবে। মন থেকেই সব। মনে যে সুর আসে, সেই সুরই ভজ।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

শব্দ বহু বহু প্রাণের মহা জাগরণের সুরের সাড়ামাত্র

৬সি, পার্বর্তী চক্রবর্ত্তী লেন, কলকাতা।
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩

নাও বেশ সিধে হয়ে বসো। বেশী করে মিশতে চেষ্টা করো। শূন্যে নিজেকে মিশাতে চেষ্টা করো। মূলশব্দ অর্থাৎ নাদ, যেটা ভাবতে ভাবতে, যেটা স্মরণ করার সাথে সাথে মন সেটা বহন করে নিয়ে যাবে। মন নাদধ্বনিকে কোথায় নিয়ে যাবে? বেদমন্ত্র...।

শব্দ কোথায় চলে যাচ্ছে। জল যেমন অগ্নির সংযুক্তে বা নিদাঘের রাগে বাষ্প হয়ে যায়, তেমনই মূল শব্দ এই স্মরণ মনন শক্তির দ্বারা ক্রমশঃ এই বাষ্পীয় জগতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে, এক যুক্ত অবস্থায় যুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং বাষ্পীয় যে স্তর বা জগৎ, তারচেয়ে যে সূক্ষ্ম, তারচেয়ে আরও সূক্ষ্ম যে জায়গা, সেথায় এই মনন শক্তি খনন করে, সেই শব্দ নিয়ে মন এগিয়ে চলে যায়। কোথায় চলে যায়? যেখান হতে এই মন প্রাণ চৈতন্য সৃষ্টি হয়েছে, সেথায় যায়।

এই ভূতে কি হয়েছে? মানুষ হয়ে জন্মেছে। **পঞ্চভূতগুলি বিভিন্ন নামে নামকরণ হয়েছে মাত্র। কিছু শব্দ মননের মাধ্যমে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে, স্মরণ ইন্দ্রিয়ে, স্পর্শ ইন্দ্রিয়ে ব্যক্ত। সেই স্পর্শে এই বিশ্বজগৎ ও তার ভাব, তার পরের জগৎ, তার পরের জগৎ অর্থাৎ বিশ্ব বিরাটের স্পর্শ থেকেই যাচ্ছে।** তারপর কি হচ্ছে? সেই স্পর্শের সাথে সাথে প্রতিটি সত্তারই সত্তা, সচেতনে চেতন হয়ে যাচ্ছে। তারপর কি হলো? শব্দ সে তার নিজের আকারে নিজ গতিতে

গতিময় হয়ে চলে গেল। তারপর শব্দ কি হয়ে গেল? কোথায় গেল? **শব্দ বহু বহু প্রাণের মহা জাগরণের সুরের সাড়ামাত্র। এই সাড়াটুকুনু দেহ ছাড়া নয়; দেহের অস্থিমজ্জা সমস্ত কিছুর সম্মিলিত মিলিত ধ্বনি মাত্র।** এই সাড়া এই ধ্বনি নিদাঘের রাগে অর্থাৎ সেই সূর্যের রাগে, তার টানে একটান হয়ে একটা সত্তারই সত্তায়, একই বৈশিষ্ট্যে তার বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়ে, স্বরূপের স্বরূপত্বকে জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। **এই বিশ্বে প্রতিটি জীবেরই নিজের সুর, নিজের শব্দ, নিজের আলোচনা, নিজের গীত মিশে যাচ্ছে মহাশূন্যে; মিশতে মিশতে মিশে যাচ্ছে অন্তরালের অন্তরে। অন্তরালের শক্তি এসে সেই শক্তির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।**

(একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে? আচ্ছা, একটু সহজ করে বলছি।)

প্রতিটি জীব এমনিভাবে আপনিই মিশে যাচ্ছে, আপনিই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তুমি নিজেও এমনিভাবে মিশে যাচ্ছ। এই শব্দ বিশ্বের গীত; মিশতে মিশতে মিশে যাচ্ছে। এই মিশে যাওয়ার অবস্থাই ক্ষয় হওয়ার অবস্থা। এটাকেই বলে এক জাতীয় পরিবর্ত্তন। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

প্রকৃতি যে সবাইকে আপনাতে মিশিয়ে দিচ্ছে, কেন? সবাইকে মিশিয়ে যে নিচ্ছে, নিশ্চয়ই তার প্রয়োজন আছে। যেইভাবে যে রূপে তুমি একদিন ছিলে, সেইরূপ কোথায় গেছে? সেই রংটি আর নেই। ক্রমশঃ ধাপে ধাপে এমনি চলে যাচ্ছে যে, ফলের সন্ধানে পথের সন্ধানে আপনি সন্ধান পেয়ে যাচ্ছে। কোন্ পথের সন্ধানে যাচ্ছে? নিজের সন্ধানে; আপনি আপনার উন্মাদনায় উন্মাদ হয়ে নিজ সন্ধানে প্রতি মুহূর্ত্তে জানিয়ে দিচ্ছে সন্ধান। নিজে সন্ধানী হয়ে সে (প্রকৃতি) নিজেকেই নিজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

ডাকাত দেখলে FIRE করবোই

সুখচর ধাম
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯

আমার মত হচ্ছে সাম্যবাদের মত, সমতার মত। তোমাদের কাজ হ'ল সমস্ত অসুরকে দমন করা আর রাম নারায়ণ রাম গান করা। আমার যে সমস্ত লেখাগুলো, নির্দেশগুলো আছে, যারা লিখে লিখে এগুলো ছাপিয়েছে, সেগুলো ভাল করে দেখবে। সেগুলো পড়তে না পারলে পড়িয়ে শুনবে। সেগুলো ভাল করে জেনে নেবে। আর নিজেদের মতো প্রস্তুতি নেবে। তৈরী হবে। যেকোন মুহূর্ত্তে তোমাদের ডাক পড়তে পারে। তারজন্য অপেক্ষা করবে। আর ঘরে ঘরে নাম করবে। **খুন আমাদের ধর্ম নয়। কিন্তু ডাকাত হয়ে আসলে হাতজোড় করে থাকবো না। ডাকাত দেখলে fire করবোই।** পরিষ্কার কথা। সেইভাবে আমরা চলবো। আমরা আগে কিছু করতে যাব না। কিন্তু আসলে (এলে) আমরা ছাড়বো না।

তোমরা সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করবে এবং সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে চলবে। আর প্রত্যেকে মনে করবে, আমি কতজনের মধ্যে বেদপ্রচার করেছি। সংসারের কর্ত্তব্যকর্ম রক্ষা করে তারপর এই কাজগুলি তোমরা করবে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারের বর্ণনায় বর্ণিত করে সমাজকে রক্ষা করবে। আদিসুরের সেই সহস্রধ্বনির সহস্র সুরের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বের সুরকে কিভাবে আনতে হয়, তোমরা জানাবে। তারজন্য তোমরাই হোচ্ছ সেই বীজ। এই বীজ

থেকে, এই সুর থেকে অনন্ত সুরকে তোমরা ধরতে পারবে। এই বিশ্বের rythm-কে তোমরা ধরতে পারবে। এইটাই হল বাস্তব সত্য। আর পরবর্ত্তী কি আছে, কি নাই, সেইটা জানার তোমাদেরও প্রয়োজন নাই, আমারও প্রয়োজন নাই। তোমরা এই সুরের সাধনা কর। ভিতরে যে জপ করছো, সেইটা একটা সুর, আর রাম নারায়ণ রাম, এই মহাকীর্তনের মাধ্যমে, মহাসুরের মাধ্যমে তোমরা জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা করবে। ঘরে ঘরে প্রত্যেকে কাজে বেরিয়ে যাবে। সমস্ত কাজকর্ম, কর্ত্তব্যকর্ম, লেখাপড়া সব করে, তারপর তোমরা কাজে বেরিয়ে যাবে। আমরা দিনরাত পরিশ্রম করছি। দিনরাত খাটছি এবং আমাদের চারিদিক ছেয়ে গেছে। চারিদিকে ছেয়ে গেছে আমাদের এই সংগঠন এবং বহু সন্তান আমাদের এই সংগঠনে যোগদান করেছে। সংগঠন বিরাট আকার ধারণ করেছে। ভারতবর্ষে কারও এত লোক নেই, যেই লোক আমাদের হয়েছে। তাই তোমরা সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে সমাজকে রক্ষা করবে। তোমরা অগ্রসর হও। তাই তোমাদের কর্ত্তব্য হলো,

(১) সমাজের অসুর দমন করা

(২) সমাজের শোষকগোষ্ঠীকে নিপাত করা এবং

(৩) সমাজে দানবগোষ্ঠী যত আছে, তাদের একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়া।

সমাজে দানবগোষ্ঠীর স্থান নেই; শোষক গোষ্ঠীর স্থান নাই। ধনীগোষ্ঠীরে ন্যাংটা কইরা নামাবো রাস্তায় এবং যতগুলি আছে সবগুলিরে যেভাবেই হোক, আমরা শায়েস্তা করবো। একটা স্কুলে যাওয়া যায় না, কলেজে যাওয়া যায় না, ধনীরা

একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। শোষকেরা একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। যারা অবহেলিত গ্রামে গ্রামাঞ্চলে যারা চাষী, যারা ক্ষেতী, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। দেখ, তারা কি করে? তাদের ছেলেপিলেরা ছেলেপুলে নয়কি? তাদের পাশে দাঁড়াও। তাদেরে গিয়ে ধর। তাদেরে ডাক, দেখ। সেইভাবে সবাইর আসন এক কর। সব স্কুল সবার জন্য থাকবে। সব কলেজ সবার জন্য থাকবে। আলাদা ব্যবস্থা দেখলেই সেখানে লাঠি ধরতে হবে। এই হামলা না করলে কেউ শুনবে না। লাঠি হল সবচেয়ে বড় ওষুধ। তখন সব সতর্ক হয়ে যাবে। আমরা সেই বেদের পূজারী এবং তোমাদের দেবতাদের মূর্তিগুলো যারা করেছে, নিয়মগুলো যারা করেছে, কোন্ উদ্দেশ্যে করেছে? দেবতা আছিল, কি না আছিল, পরবর্ত্তী কথা। মূর্তিগুলোর মাধ্যমে যা দেখতে পাচ্ছ, সব লাঠিঠেঙ্গা লইয়া তারা মারপিট করেছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তবেই তারা দেবতা হয়েছে। তার সন্তানেরা যেন ঐভাবে আর বসে না থাকে। তাই আমরা যে বেদের ধারায় চলছি, যে রাম নারায়ণ রাম করছি, এই রাম নারায়ণ রাম এখানকার রাম নারায়ণ রাম নয়। মহাকাশের মহানাম মহান্ অর্থবোধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যুক্তিসম্মতভাবে বিরাট অর্থবোধে হচ্ছে এই শব্দ রাম নারায়ণ রাম। সেই শব্দধ্বনিতে সেই নাম তোমরা করছো। এই নাম আমি দিচ্ছি। তার বীজ দিচ্ছি সবাইকে। আর কিছু নয়। আমরা যেন একসুরে সবাই থাকি। এক সুরে থেকে একসুরে যাতে চলতে পারি, তারই প্রচেষ্টায় করবে এই নাম রাম নারায়ণ রাম। তাই তোমরা সেইভাবে কাজকর্ম করবে, সেইভাবে চলবে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন ডট কম্

www.avinabadarshan.com

অভিনব দর্শন ডট কম্ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে Web দুনিয়ায়। এই Website-টি জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্বময় কর্মজীবন ও বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব দর্শনের উপর ভিত্তি করে রচিত। এই Website-টি বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের অন্তর্গত ১০-১২টি সংগঠন বা কোন ট্রাষ্টের official site নয়। এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে কিছু ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইদের ব্যক্তিগত কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত ও পরিবেশিত। এই Website-টি সম্পূর্ণ মুক্ত এর জন্য কোন Donation বা অনুদান গ্রহণ করা হয় না।

আমাদের দেশে হাজার হাজার বছর আগে বেদের যুগে যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ অশ্রুতপূর্ব তত্ত্ব ও তথ্য প্রাঞ্জল ভাষায় উদ্ঘাটন করেছেন। বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তির দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন পূর্ণত্বে, ব্যাপ্তিত্বে, বস্তুনিষ্ঠায় যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা সৃষ্টির ধারার মত সাবলীল, স্বচ্ছ ও সর্বজনগ্রাহ্য, সেই আদিবেদের সঙ্গে অধুনা প্রচলিত সাম্যবাদের কোথায় কোথায় সাদৃশ্য এবং কোথায় কোথায় পার্থক্য তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন।

এই Website-এর উদ্দেশ্য হলো, আদিবেদের প্রকৃত তত্ত্ব দর্শনকে তুলে ধরে সমাজকে জাগিয়ে তোলা। বেদের তত্ত্বকে আশ্রয় করে ধর্মনীতি, রাজনীতি, মন্ত্রতন্ত্র ও দেবদেবী সম্বন্ধে প্রচলিত ধ্যানধারণা গুলির প্রকৃত বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা এবং সমাজের বুকে সেই আদর্শের সার্থক রূপায়নের মাধ্যমে সমাজকে গড়ে তোলা এবং সমাজে জনজাগরণ ঘটানো। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায়, ''জনচেতনা প্রথমে আন কলমে, কামানে নয়। ন্যায়, নিষ্ঠা, সত্যের সেই কলম চালিয়ে যাও।'' তাই লেখনির মাধ্যমে আদিবেদের তত্ত্ব, দর্শন ও আদর্শ প্রচার করা আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।

বেদনীতিই হলো জীবনীতি — জীবের সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতি — যা আজকের সমাজ প্রায় বিস্মৃত। আমাদের কাজ হলো, বেদনীতি প্রচারের মাধ্যমে সমাজে জনজাগরণ করা। বেদের যুগের শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি আবার ফিরে আসুক, এটাই হলো আমাদের মুখ্য কামনা। তাই আদিবেদের বিজ্ঞান ভিত্তিক তত্ত্বের আলোকধারাকে সকলের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেবার দায়িত্ববোধে আমাদের এই Website অভিনব দর্শন ডট কম্।

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ এসেছেন ইতিহাসের ধারায়, জন্ম থেকেই প্রকৃতির নিজস্ব সুর নিয়ে। তাই অষ্টসিদ্ধিতে তাঁর জন্মগত অধিকার। সেইজন্যই বাস্তবের কোন মাপকাঠি দিয়ে তাঁর বিচার করা চলে না। নিজ নিজ উপলব্ধির স্তর বা মাত্রা থেকে তাঁকে বুঝতে হবে। তাই আমাদের প্রিয় Viewer-দের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক মতামতকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

অভিনব দর্শন ডট কম্-এর পক্ষে
চপল মিত্র

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা, S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) বীরেন্দ্র দর্শন, জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোল-৫, ফোন- ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) শৈবাল ঘোষ, সালকিয়া, হাওড়া, ফোন - ৯২৩১৫৪২৯৯৫
৮) কোলকাতা বইমেলা।
৯) জলধর সাহা, সেক্রেটারী সন্তান দল, মেঘালয়, মোঃ- ৯৪৩৬১১২৬০১
১০) বলরাম, ৩৪ এস.কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮, মোঃ- ৯৮৩৬৬৯৯৪৪৮
১১) Lakshindhar Das, Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১২) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন, লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৩) সুভাষ ঘোষ, বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন - ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৪) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন - ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৫) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, আসানসোল, ফোন - ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৬) মধুসূদন মৈত্র পুরুলিয়া, ফোন - ০৯৮৩১৬১১৬৮৪
১৭) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা, ফোন - ৯০০৭০৭৫১৯৯
১৮) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
১৯) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
২০) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
২১) বালক ব্রহ্মচারী যোগ মন্দির, লিলুয়া, হাওড়া, ফোন - ৯২৩০৯১৩৬৫৫
২২) ভোলানাথ দাস, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪
২৩) তপন / অনিমা গাঙ্গুলী, মানকুন্ডু, হুগলী, ফোন - ২৬৮৫-৬১৪৬
২৪) কালিপদ চক্রবর্ত্তী, পাখানজোড়, ছত্রিশগড়, মোঃ- ৯৪০৬০০১৫৭২
২৫) গনেশ রায়, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ৯৭৪৯০৯০১৮২
২৬) বেদ অভেদ ধাম, হরে কৃষ্ণ, আলিপুরদুয়ার জং, মোঃ- ৯৪৩৪২০৪৫৯০
২৭) ইতি বর্মন, দিনহাটা, কোচবিহার, মোঃ- ৯৯৩২৬৩৯৬৩৯
২৮) পার্থ / চৈতালী রায়, পাণ্ডুয়া, হুগলী, মোঃ- ৯৪৩৪০১১৫৮৫
২৯) আর.এন.আর এন্টারপ্রাইজ, ফোন - ২৪৪০-৯১৫১
৩০) ডঃ সুধাংশু দত্ত, মালিগাঁও, গুয়াহাটি, আসাম, ফোন - ০৯৪৩৫১৯০৭৮১
৩১) বিভাস চক্রবর্ত্তী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ০৯৬৪৭৭৯২৫২২
৩২) ভগীরথ সাহা (ভগু), গোয়ালাপট্টি, কোচবিহার, মোঃ- ০৯২৩৩২৩৭৬৬৬
৩৩) বেদধাম, ইছাপুর, উঃ ২৪-পরগণা, মোঃ- ০৯৪৩৩৯৫৯১৩৮

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি	প্রকাশকাল
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫) পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭) মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮) আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯) কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০) জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১) তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২) মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩) পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪) চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬
২৫) মনই সৃষ্টির উৎস	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬
২৬) সাধু হও সাবধান	শুভ মহালয়া, ১৪১৬
২৭) লং পাহাড়ের ডায়েরী	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৬
২৮) বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদ	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯
২৯) যত্র জীব তত্র শিব	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৬
৩০) ম্যাসেঞ্জার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৭
৩১) আলোর পথিক	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৭
৩২) নাদ ব্রহ্ম	শুভ রাখী পূর্ণিমা, ১৪১৭
৩৩) বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৭
৩৪) চিন্তন	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১০
৩৫) মহা জাগরণ	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৭

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫